KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection KLMLGK	Publisher মীর ওয়াহাব
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫০/১ ৫০/২ ৫০/৩ ৫০/৪	Year of Publication বৈশাখ ১৩৯৬ // May 1989 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬ // Jun 1989 আষাঢ় ১৩৯৬ // July 1989 শ্রাবণ ১৩৯৬ // Aug 1989
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor আব্দুর রউফ	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা জুলাই ১৯৮৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

রুশদীর "শয়তানের পদাবলী" এবং খোমেইনির মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আলোড়িত আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন ভাবনার ভালোমন্দ বিশ্লেষণ করেছেন গৌরী আইয়ুব।

মুসলমান সমাজ এবং স্বদেশ প্রসঙ্গে আবুল কালাম আজাদের চিন্তাধারার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন পুলকনারায়ণ ধর।

ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে এই বিপ্লব সংঘটনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল পারির যেসব নিচুতলার মানুষ, তাদের ভূমিকা—সম্পর্কে লিখেছেন অমলেন্দু সেনগুপ্ত।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রসসিক্ত আলোচনা সহ অনুবাদ করেছেন লাতিন আমেরিকার অগ্রগণ্য সাহিত্যিক হুয়ান রুলফোর দুখানি অনবদ্য গল্প।

তৃপ্তি মিত্র প্রসঙ্গে একটি প্রতিভার পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে দেখার মহৎ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন খালেদ চৌধুরী।

"ব্যক্তিত্বের সন্ধানে ভারতীয় নারী"—গ্রন্থসমালোচনাভিত্তিক এই নিবন্ধটি লিখেছেন ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভাষাবিজ্ঞানীর এ কোন্ শোচনীয় পরিণতি!"—বাংলাদেশের ভাষাবিজ্ঞানী হুমায়ুন আজাদ প্রসঙ্গে মৃণাল নাথের আলোচনা।

সমাজজীবনের অনুষঙ্গে বিকাশ ভট্টাচার্যের "দুর্গা চিত্রমালা" নিয়ে সমীর ঘোষের আলোচনা।

চতুরঙ্গ

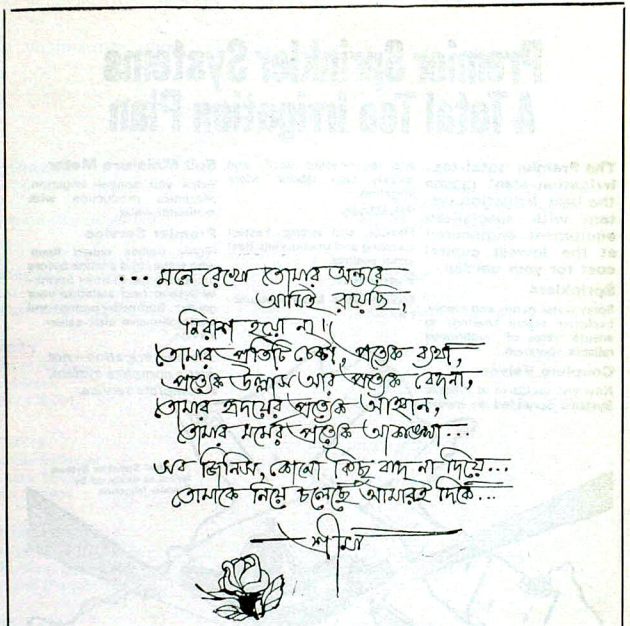

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ৬
জুলাই ১৯৮৯
আষাঢ় ১৩৯৬

রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি গৌরী আইয়ুব ১৯৭
ফরাসি বিপ্লব ও পারীর নীচের মহল অমলেন্দু দাশগুপ্ত ২০৭
আবুল কালাম আজাদের চিন্তাধারা পুলকনারায়ণ ধর ২২৪
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ২৫০
বাঙলায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার বিবর্তন অমিতাভ রায় ২৬৪

নেশা মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ২১৯
অতর্কিত পদ্ম গৌতম হাজরা ২২০
কোয়েলিন ফল বিপ্লব মাজী ২২১
ঘরে বাইরে কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ২২৩

দুটি বিদেশী কাহিনী হুয়ান রুলফো / মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪০

স্মরণে ২৫৬
তৃপ্তি মিত্র খালেদ চৌধুরী / সুনীল সেন

গ্রন্থসমালোচনা ২৭২
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলেন্দু ধর, মৃণাল নাথ

চিত্রকলা ২৮৮
সমাজ-জীবনের অনুষঙ্গে 'দুর্গা'-চিত্রমালা সমীর ঘোষ

মতামত ২৯২
তরুণ পাইন, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, কল্যাণকুমার দত্ত

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অপেক্ষমান হাজার হাজার আবেদনকারীকে বঞ্চিত করে এক শ্রেণীর লোক অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরি করে চলেছে হুকিং ও ট্যাপিং করে। ফলে গ্রাহকের ঘরে জ্বলছে না আলো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে জ্বলে যাচ্ছে ট্রান্সফরমার। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নেমে আসছে অন্ধকার।

পশ্চিমবঙ্গে যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ঘটেছে তখন সুষ্ঠু বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী সক্রিয়। বিদ্যুৎ চুরির মোকাবিলা করুন, বিদ্যুৎ চোরের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরো কঠিন এবং জামিনের অযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

প্রকাশন শিল্পে অন্য ধারার···

যামিনী রায় [১৯৮৭]
বিষ্ণু দে ৩০.০০

রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা [১৯৮৭]
বিষ্ণু দে ১৫.০০

সৃজন সাহিত্য : নানান ভাবনা [১৯৮৭]
অরুণ মিত্র ২০.০০

নাট্যভবিতব্য ও রবীন্দ্রনাথ [১৯৮৭]
কুমার রায় ২৫.০০

নবীন রাজা [১৯৮৮]
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ৩০.০০

বাবু থিয়েটার [১৯৮৬]
বিষ্ণু বসু ১৮.০০

রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার [১৯৮৭]
বিষ্ণু বসু ২৫.০০

রূপতাপস যামিনী রায় [১৯৮৮]
সম্পাদনা : প্রশান্ত দাঁ ৭৫.০০

ঠুমরী ও বাঈজী [১৯৮৬]
রেবা মুহুরী ২০.০০

চলচ্চিত্রের ঘর বাহির [১৯৮৬]
সোমেন ঘোষ ৩০.০০

তিরিশ পরবর্তী বাংলা কবিতার দিক্‌চিহ্ন [১৯৮৮]
পরিমল চক্রবর্তী ৩৫.০০

ব্রেশ্‌ট ও তাঁর থিয়েটার [১৯৮৯]
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০.০০

চার্লি চ্যাপলিন : একটি সশ্রু ভালবাসা [১৯৮৯]
ইরাবান বসুরায় ৩০.০০

প্রতিভাস ১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড কলকাতা-৭০০০০২

রুশদী, খোমেইনি এবং আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

গৌরী আইয়ুব

সলমন রুশদী "মিডনাইট্‌স্ চিলড্রেন" লিখে কেবল পৃথিবীর সাহিত্যরসিক-সমাজে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু "দ্য সেটানিক ভার্সেজ" লেখার পর শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সারা দুনিয়ায় অসংখ্য লোক তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—অবশ্য বইটা না পড়েই প্রধানত। এমনটা যে হবে তা তিনি একেবারেই ভাবতে পারেন নি একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁর এই বই যে অনেকখানি উত্তেজনা এবং উত্তাপও সৃষ্টি করবে এবং প্রচুর বিকোবে, এ বিষয়ে তাঁর প্রকাশকরা যথেষ্ট নিশ্চিতি না পেলেও যে অমন একটা অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতেন একথা আমার অন্তত মনে হয় না। প্রকাশকরা কেউ-কেউ পাকা জহুরি বটে, কিন্তু তাঁদের কষ্টিপাথরে ঘষে যে সাচ্চা সোনার দাগ যাচাই করে নেন সেটি সর্বদা সাহিত্যের নান্দনিক মূল্য নয়।

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে প্রকাশকরাও মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলেন যে বেশ একটা গরম জিনিস ছাপতে যাচ্ছেন এবং রুশদীও ভালোই জানতেন কেমন মুখরোচক বস্তু বাজারে ছাড়ছেন। জন্মসূত্রে মুসলমান বলে নয়, ইসলাম ধর্মতত্ত্ব আর মুসলিম ইতিহাসের ব্যুৎপন্ন ছাত্র হিসাবেই, তিনি যে বিষয়ে কলম ধরবার ঝুঁকি নিয়েছিলেন সে বিষয়ে তন্ন-তন্ন করে জেনেও নিয়েছিলেন। এর যথেষ্ট প্রমাণ তিনি তাঁর রচনায় দিয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে তিনি কিছুকাল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন করেছেন বলেও শোনা যায়।

যে কারণেই হোক, পয়গম্বরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই। হজরৎ মহম্মদ যে-বাণীর বাহক সেই বাণীকেই শয়তানের উক্তি বলতে তিনি দ্বিধা করেন নি। পয়গম্বর যে বহু নারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন—তা অনাথাকে আশ্রয় দেবার জন্যই হোক বা শত্রুগোষ্ঠীর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করার জন্যই হোক—এই ব্যাপারটিকেই রুশদীর এত অনৈতিক মনে হয়েছে যে এটা নিয়ে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ আর অরুচিকর কাহিনী রচনা করতে বাধে নি তাঁর। এইরকম একটা বিরূপ মনোভাব থেকেই তিনি স্বল্পাচ্ছাদিত ইতিহাসের যথেচ্ছ বিকৃত চেহারায় ইসলামের উদ্ভব ও বিকাশের কাহিনী পরিবেশন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর পারিবারিক ধর্ম পরিত্যাগ করেছেন।

পয়গম্বর, কোরান শরীফ এবং ইসলামের বিষয়ে তাঁর মনে যা-কিছু তীব্র

সমালোচনা আছে সেসব নিয়ে সরাসরি প্রবন্ধ লিখে আক্রমণ করাটা তাঁর ধারা নয়। তিনি ঔপন্যাসিক হিসেবে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার ঐতিহাসিক নামধাম বেশ খানিকটা রেখেও দিয়েছেন যাতে তাঁর আক্রমণের উদ্দিষ্ট যাঁরা তাঁদের শনাক্ত করা কঠিন না হয়। কোথাও বা নামধাম, কোথাও ইতিহাস তাঁর নিজস্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই বিকৃত করে নিয়েছেন। মোটকথা, তাঁর উপন্যাসের বিতর্কিত অধ্যায় দুটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি আমি ইতস্তত দেখেছি। তাতে ইসলামের বাণীবাহকের যে ধরনের সমালোচনা আছে তার ভাষা ও ভঙ্গির ইতরতা আমার পক্ষেও পীড়াদায়ক ঠেকেছে, যদিও আমি নাস্তিক মানুষ। এটাকে রুশদীর অসাধারণ সাহস বা দুঃসাহস যাই বলা হোক না কেন, একথাও বোধ হয় বলা যায় যে এই কাজ করে কতখানি বিপদের ঝুঁকি তিনি নিচ্ছিলেন তা বোধহয় সম্পূর্ণ নিজেও বুঝতে পারেন নি।

নয়তো খোমেইনির ধমকের প্রথম ধাক্কাতেই অতখানি বিচলিত বোধহয় হতেন না। তা ছাড়া, এই যে তিন-চার মাস ধরে পুলিশ প্রহরায় আত্মগোপন করে থাকতে হচ্ছে, এ তো সম্ভবত আজীবন চলবে। এতখানি যে প্রাণে বিপন্ন হবেন তা বুঝতে না পারার কারণ কি এই যে বহুকাল পশ্চিম দেশের পারমিসিভ সমাজে বাস করে অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল? পরে, আক্ষরিক অর্থে প্রাণের দায়ে, দুঃখপ্রকাশ করে বলেছেন বটে যে কারুর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। কিন্তু এটা স্পষ্টতই মিথ্যা কথা। ইসলামের ভিত্তি যে শাস্ত্র তাকেই তিনি শয়তানি গাথা বলেছেন এবং বলার একটা চতুর অনুষঙ্গও খুঁজে বার করেছেন। তাঁর অভিপ্রায়কে ভুল বোঝার কোনো ব্যাপার নেই। মহম্মদকে মেহাউণ্ড আখ্যা দেওয়ায় তাঁর কোনো মৌলিকতা নেই ঠিকই, তবু পাছে কেউ এর আপত্তিকর তাৎপর্য সবটুকু ধরতে না পারে তাই তিনি আগ বাড়িয়ে বলে রেখেছেন,

'Blacks all chose to wear with pride the names they were given in scorn, like wise, our mountain-climbing, prophet-motivated solitary is to be the medieval baby-frightener, the Devil's synonym : Mahound.

অর্থাৎ তিনি সচেতনভাবে সুকৌশলে যা করতে চেয়েছেন সেটাই মুসলমান সমাজও স্পষ্টই বুঝতে পেরেছেন। তাঁর শেষতম পুস্তকে যে পদাঘাতটি আছে তা যাঁদের গায়ে লাগবার তাঁদের গায়ে ঠিকই লেগেছে এবং তাঁরা সঙ্গতভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং আরো অনেককে ক্ষুব্ধ আর উত্তেজিত করে তুলেছেন। রুশদী যতটা আশঙ্কা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশিই ক্রুদ্ধ হয়েছেন এঁরা। সবচেয়ে বেশি এই ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দিয়েছে লেখকের প্রতি এক ধর্মগুরুর মারাত্মক প্রাণদণ্ডের ঘোষণা। আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়ে অনেক সময়ই মনে থাকে না সেটা কত দূর ছড়াতে পারে।

খোমেইনি এমন একটা হৈ-চৈ তুলে না দিলে বেশি লোকে বইটা পড়ত না এটা হয়তো ঠিক। যারা পড়ত তারাও বিশেষ কেউ বুঝতে পারত না বলে যাঁরা বলছেন তাঁরা অনেকে দাবি করছেন যে রুশদীর অতি-বিদগ্ধ রচনাশৈলী আর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সাধারণের অধিগম্য নয়। কেউ বা এসে বললেন, রুশদী জেম্‌স্ জয়েসের উত্তরসূরী···এক পাতা জুড়ে একটা বাক্য লেখেন! দুই লেখকের সম-মানের এমন অকাট্য যুক্তি শোনার পর মিডনাইট্‌স্ চিলড্রেন আর তাঁর প্রথম বই গ্রিমাস হাতের কাছে পেয়ে খুলে বসলাম। বুঝতে যথেষ্ট অসুবিধা না হওয়ায় অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলাম। তবে কি দুই প্রস্থ অর্থ আছে এই অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের? আর আমি উপরি-তলেই ঠেকে গেছি? যাই হোক একটি বাক্যাংশ আমাকে চমৎকৃত করল : "because in auto-biography, as in all literature, what

actually happened is less important than what the author can manage to to persuade his audience to believe....' এই তো! হাজার কথার এক কথা বলেছেন।

যে লেখক বা ভাবুক সমাজের অনুগামী নন, বরং অগ্রগামী—তিনি এমন কথা বলতেই পারেন যা চিরাচরিত সংস্কারকে আঘাত দেবে। কোনো লেখকের কতটা আঘাত করার নৈতিক অধিকার আছে আর পাঠকের আঘাত গ্রহণ করার নৈতিক দায়িত্বও আছে —এইসব নিয়ে অন্তহীন বিতণ্ডার পরিপ্রেক্ষিতে জানা কথাটাই আর-একবার মনে করিয়ে রাখা যাক। পুরানো সংস্কারকে যাঁরা ভাঙতে চান, নূতন ভাবনাচিন্তা যাঁরা করেন, তাঁরা অনেকেই ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক বহুজনের অভ্যস্ত এবং সযত্নলালিত বিশ্বাসে আর আচার-আচরণে আঘাত দিয়ে থাকেন। স্বয়ং পয়গম্বরও আঘাত দিয়েছিলেন, প্রত্যাঘাতও পেয়েছিলেন। তাঁর অনুসারীরাও কম আঘাত করেন নি প্রতিপক্ষকে। আরব-পারস্যের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস এবং দেবদেবীকে ধ্বংস করেই ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রসার ঘটেছিল, একথাও সবাই জানেন।

অর্থাৎ আঘাতমাত্রই সমাজের বা ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর নয়—কোনো-কোনো আঘাত প্রগতির পথ প্রশস্ত করে। আধমরাদের ঘা মেরেই নাকি বাঁচাতে হয়। এইসব কথা আমাদের নিতান্ত অজানা নয়, কিন্তু সব সময়ে মনে থাকে না। তাই বলে আবার সব আঘাতই দেহমনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে, এ দাবি তর্কশাস্ত্রের নিয়মেও টেঁকে না, বাস্তবেও তেমনটা ঘটে না। কোনো-কোনো ট্রমা কত মারাত্মক হয় সেও আমাদের জানা আছে। কতখানি আঘাত কিভাবে কোথায় দিলে উপকার হবে, শরীরমনের ক্ষতি করবে না, তা জানেন বিচক্ষণ থেরাপীস্ট। রুশদী তেমন থেরাপীস্ট বলে বেশি লোকের প্রতীতি জন্মায় নি। আচমকা কোমরবন্ধের নীচে আঘাত করে একটা উত্তেজনা এবং অনেকখানি অশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এতে বুদ্ধির শুদ্ধি কতখানি হবে তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

প্রতিতুলনায় আর্নল্ড টয়েনবীর সেই রচনার কথা মনে পড়ছে যার জন্য স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার আপিস আক্রান্ত হয়েছিল। কৌতূহল সত্ত্বেও এতদিনেও সেই রচনাটি স্বচক্ষে দেখতে পাই নি। তবে শুনেছি টয়েনবী নাকি তাঁর সেই প্রবন্ধে হজরত মহম্মদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর তুলনা করে, কেন তিনি দ্বিতীয় জনের মত পথ ও চারিত্র্যের বেশি গুণগ্রাহী, সেই কথাটাই ব্যাখ্যা করে বলতে চেয়েছিলেন। এজাতীয় বক্তব্যে সব ধর্মপ্রাণ মুসলমানই একটু ক্ষুণ্ন হতে পারেন এবং রাজনীতির ব্যাপারীরা এই ক্ষোভকে ব্যবহার করে অনেকখানি জল ঘোলা করার চেষ্টাও করতে পারে। তবু এই-জাতীয় রচনা যেহেতু বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ বা কটূক্তি নয়, সীরিয়স আলোচনা, তাই এ নিয়ে তন্নিষ্ঠ তাত্ত্বিক বিতর্কের সুযোগ থাকে। প্রতিপক্ষও কিছু যুক্তিতর্ক পেশ করে লেখকের প্রতিপাদ্যকে খণ্ডন করতে পারেন।

কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা হয় শুধু লোককে খেপিয়ে দেবার জন্য, সুস্থ মত-বিনিময়ের জন্য নয়।

আবার রুশদী যখন বলেন তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির সঙ্গে ঐতিহাসিক বহু চরিত্রের ও নামের সাদৃশ্য নেহাত-ই আপতিক, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁর এই আত্মপক্ষসমর্থক উক্তি নিতান্তই কাপুরুষের মিথ্যাভাষণ। এই পর্যন্ত লিখতে-লিখতে খবর পাওয়া গেল আয়াতুল্লাহ খোমেইনির আজ মৃত্যু হয়েছে। তাঁর আত্মা যথার্জিত শান্তি লাভ করুক। কিন্তু তিনি তাঁর পিছনে আমাদের জন্য বিশেষ শান্তির সম্ভাবনা রেখে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পরেও ধর্মান্ধ বা অর্থগৃধ্নু ঘাতকের হাতে রুশদীর প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা কিছুমাত্র কমে নি।*

* পাছে এ বিষয়ে কারুর মনে কোনো অলীক প্রত্যাশা জাগে তাই আয়াতুল্লাহ্-র মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রিটেনের

এই-জাতীয় কোনো ঘাতকের হাতে আত্মবলি না দিয়ে কেউ যদি আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও থাকেন তবু তাঁর এই দুর্বল আচরণকে মানবিক দৃষ্টিতে কতখানি নিন্দা করা যায় তার আলোচনায় আমি যাব না। কিন্তু কেউ যখন সক্রেটিস কি ব্রুনোর আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'রুশদী যদি সৎ লেখক হন তাহলে তাঁর রচনার প্রতিটি শব্দ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সমর্থন করে বীরের মতো মৃত্যু-বরণ করাই উচিত, আমি হলে তাই করতাম'—তখন বক্তাকে শুধু সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেব যে এত বড়ো কথা বলার অধিকার শুধু তাঁরই জন্মায় যিনি বলবার জন্য আর বেঁচে থাকেন না।

যাই হোক, রুশদী-খোমেইনি নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিটা বুঝবার চেষ্টা করছি। তাঁর বইখানা এদেশে নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত খুশবন্ত সিং ছাড়া আর কে কে সেই বই পড়েছিলেন জানি না। কিন্তু বইটা নিষিদ্ধ হতেই অগুনতি লোকের যে টনক নড়েছিল এবং বহু লোক পড়বার জন্য কুতূহলী হয়েছিলেন, সে কথা ঠিক। বই নিষিদ্ধ করার ব্যাপারটা প্রথমে আমিও অনেকের মতোই খুব অপছন্দ করেছিলাম। দেশে অশান্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে অপ্রিয় হবার ভয়ে সরকার অব্‌স্‌কিউরান্‌টিস্টদের তোয়াজ করছেন বলে মনে হয়েছিল। (এ ব্যাপারে আমি ভোটের হিসেবটা তেমন বুঝতে পারি না—যদিও সরকারের প্রতি এই দোষারোপ অনেকেই এবং প্রায়ই করে থাকেন। সংখ্যালঘুদের মনরক্ষা করে যদি তাদের সব ভোট-ও পান তবু এই দেশের কোন্ সর্বভারতীয় দলের ইষ্টলাভ হবে, যদি তারই ফলে তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি যে-সংখ্যগুরু তাদের বিমুখ করেন?)

যাই হোক, নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে মত একটু পালটালাম যখন দেখলাম বোম্বাই অঞ্চলের বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী—যাঁদের অধিকাংশই অমুসলমান—রাজীব গান্ধীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে একটি বিবৃতি ছাপলেন। তখন মনে হল বইটাতে বিস্ফোরক কী আছে জানা দরকার। অগত্যা যাঁরা বইটা পড়বার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মতামত যেখানে যতটুকু হাতের কাছে পেলাম পড়ে দেখলাম। আমি স্বীকার করব যে কেবল সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বক্তব্য পড়েই আমার মনে হয়েছে যে ওই বইয়ের বিতর্কিত অংশটা তিনি ভালো করে পড়েছেন এবং সমস্তটা অনুষঙ্গ ধরতেও পেরেছেন। এদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অন্য কারুর লেখা থেকেই আমার এ প্রত্যয় জন্মায় নি।

সেই সময় থেকেই লেখকের মতপ্রকাশের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আর প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের সব রকম বই-ই অবাধে পড়বার নিরব্যাঢ় অধিকার ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা গণতান্ত্রিক দাবি উঠেছে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে। আবার রুশদী এবং তাঁর এই বইকে কোনো-মতেই ওই স্বাধীনতা বা অধিকার যেন দেওয়া না হয় তার জন্য পালটা দাবিও জোরদার হয়েছে। দুই পক্ষের এই দাবিদারদের মাঝখান দিয়ে স্পষ্ট একটা সাম্প্রদায়িক সীমারেখা টানা যায় বললে বোধহয় অন্যায় বলা হয় না। রুশদীর নিন্দা কোন মুসলমানের মুখে শুনলেই অন্যপক্ষ নিশ্চিত হচ্ছেন, ইনিও তাহলে আর-সব মুসলমানের মতোই সাম্প্রদায়িক—সম্ভবত মৌলবাদের সমর্থক! আবার যখনই কোনো হিন্দু রুশদীর সমর্থনে মুখ খুলছেন অমনি তাঁর সম্বন্ধে অপর পক্ষের ধারণা জন্মাচ্ছে, ইনিও তাহলে সব হিন্দুর মতোই মুসলমানের হেনস্থায় খুশি হন···তাদের দিকটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখবার মতো মন নেই। ইদানীং কালে রুশদীর চেয়ে বড়ো অন্য কোনো বিভাজক দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষের মাঝখানে লক্ষ করি নি।

রুশদীর সমর্থকদের বক্তব্য অবশ্য ম্যাস মিডিয়াতে—বিশেষ করে পত্রিকাতেই—বেশি পেয়েছি···অন্য পক্ষের কথা মুখে বেশি শুনতে পাই। কারণ এদেশের ম্যাস মিডিয়া তাঁদের হাতে তেমন নেই। এঁরা অনেকেই এসে বলছেন যে যাঁরা লেখকের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কোমর বেঁধেছেন তাঁদের আসল উৎসাহের বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ততটা নয়। এঁরা বেশির ভাগই ইসলামের কুৎসা ও মুসলমানের অপমানে চিরদিনই আনন্দ পান বলেই এই বই নিয়েও এত মাতামাতি করছেন। যদি নিরপেক্ষভাবে সবারই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করবার জন্য এঁরা উৎসুক হতেন তাহলে "নাইন আওয়ার্স টু রাম" কিংবা "রাম রিটোল্ড" কিংবা "ইতিহাসের শ্রীচৈতন্য"-ও অবাধে পড়বার অধিকার অর্জন করবার জন্য তাঁরা কোনো আন্দোলন কেন ইতিপূর্বে করেন নি? হিন্দু সমাজ যদি এতই বেশি সমালোচনা-সহিষ্ণু এবং উদার-দৃষ্টিসম্পন্ন হয়, তাহলে আজও ওইসব বইয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রয়েছে কী করে? আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাইবে। ওই-সব লেখকরা রুশদীর তুল্য নামী দামী নন বলেই এবং তাবৎ দুনিয়া ওঁদের হয়ে লড়তে এগিয়ে আসেনি বলেই তো ওঁদের রচনা প্রকাশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসা উচিত ছিল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের।

আমি তাঁদের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারি নি। উক্ত বইগুলির অন্তত একটির উপর থেকেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে দেখা যাক না হিন্দু-সমাজের গাঙ্গিয়ানরা কী বলেন। কিংবা ড. আম্বেদকরের যে বই ("রিডল্‌স অব হিন্দুইজম্?") মহারাষ্ট্র সরকার ছাপতে রাজি হয়েও এখন হিন্দু মৌলবাদীদের ভয়ে গড়িমসি করছেন, সাপের ছুঁচো গেলার দশায় রয়েছেন বেশ কিছুকাল যাবৎ, সে বইখানি যাতে অখণ্ডিত আকারে অবিলম্বে ছাপা হয় এই দাবিতে একটা আন্দোলন করুন না কেন উচ্চবর্ণের বুদ্ধি-জীবীরা? এই দায়িত্ব কেবল দলিতদের উপরেই বর্তেছে কেন?

পাঁচ ছয় মাস ধরে রুশদীর বই নিয়ে শিক্ষিত-সমাজে যে স্পষ্ট দুটি সাম্প্রদায়িক শিবির হয়ে গিয়েছে, এর পিছনেও আছে দেশের সামগ্রিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির জের। ইদানীং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদের প্রবক্তারা জেদা-জেদি করে যেখানে নামিয়ে এনেছে তাতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আবার যেন তুঙ্গে উঠেছে। ফলে রুশদীর প্রাণদণ্ড ঘোষণায় একদিকে নৈতিক ধিক্কার যেমন সোচ্চার, অন্যদিকে নৈতিক প্রশ্রয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব হলেও সুস্পষ্ট। দুই পক্ষের প্রতিক্রিয়ায় এই বিরাট বৈষম্যের কারণ বুঝবার জন্য অন্য একটা ব্যাপারের দিকেও একটু দৃষ্টি দিতে হবে।

ইরানের আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নী। এঁদের শ্রদ্ধা ও সমর্থন সাধারণভাবে আয়াতুল্লাহ্-র পক্ষে তেমন যাবার কথা নয়। বিশেষত এই আয়াতুল্লাহ্ যেভাবে সুন্নী ইরাকের সঙ্গে ৮ বৎসর ধরে একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়ে এসেছেন এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে বিষ গেলার মতো করে সন্ধি স্বীকার করেছেন তাতে তাঁর প্রতি ভারতীয় মুসলমানের বিরাগ যথেষ্ট প্রবল হবারই কথা ছিল।

কিন্তু আয়াতুল্লাহ্ শিয়া বা সুন্নী যাই হোন না কেন, তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসেও আর একবার ইরানে একটি আদি ও অকৃত্রিম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন, স্বৈরাচারী শাহ এবং তাঁর পশ্চিমী আধুনিকতাকে দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। অর্থাৎ যে পরিমাণে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামের মূলে প্রত্যাবর্তন করার চেষ্টা করছিলেন, কোরান শরীফের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ও সমাজকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করছিলেন, সেই পরিমাণেই গোষ্ঠীনিরপেক্ষভাবে সব ধর্মোৎসাহী মুসলমানেরই

মুসলমান সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ড. কলিম সিদ্দিকী ঘোষণা করে দিয়েছেন যে রুশদীর প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা এখনও বলবৎ রয়েছে। রুশদী যে ধর্মীয় আইন লঙ্ঘন করেছেন তার শাস্তি মৃত্যু! অর্থাৎ আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি চলে গেলেও হত্যার চেষ্টা চলছে, চলবে।

সমর্থন লাভ করছিলেন। মৌলবাদের একটা আদর্শগত আকর্ষণ তো থাকেই—শুদ্ধতায় ফিরে যাবার একটা আনন্দময় প্রত্যাশা! কিন্তু একদেশদর্শী গোঁড়ামি আর আপোসহীন নিষ্ঠুরতাই মৌলবাদকে ভয়াবহ করে তোলে কার্যক্ষেত্রে। তাই বাস্তবে দেখা গেল অগণিত হত্যার বিভীষিকায় অন্ধকার, রক্তপিচ্ছিল পথে যখন বিশুদ্ধ ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করছিলেন খোমেইনি তখন অমুসলমানের চোখে খোমেইনির ভয়াল ভাবমূর্তি আর মৌলবাদের নঞর্থক দিকটাই বড়ো হয়ে উঠছিল। কিন্তু আমার মনে হয় এদেশের বহু মুসলমানের চোখে—শিয়া সম্প্রদায়ের বাইরেও —খোমেইনির ভাবচ্ছবি অমন অবিমিশ্র কালো নয়।

খোমেইনি সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এই মৌলিক পার্থক্য আছে বলেই তাঁর ফতোয়া সম্বন্ধেও নির্দ্বিধ নিন্দাও যেমন ভারতীয় মুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না, তেমনি সামান্যতম সমর্থনও অমুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা বাতুলতা। খোমেইনির এই প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা এই সাহিত্যের সঙ্গে জড়িয়ে না গেলে রুশদীর রচনায় মুসলমান সমাজের বেদনাকে একটু সহানুভূতির সঙ্গে সম্ভবত অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন হিন্দুসমাজ। তা তো হয়ই নি, বরং উলটে মুসলমানের আগ্রাসী চরিত্র বিষয়ে হিন্দুর মনে যে বদ্ধমূল একটা ধারণা আছে তাকেই আরো প্রবল করেছেন আয়াতুল্লাহ্ খোমেইনি। ঘটনাচক্রে আবার রুশদী সংক্রান্ত ব্যাপারে সুন্নী জগতের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রচারিত হবার আগেই শিয়া পরাস্তের প্রতিক্রিয়া যেন আণবিক বোমার মতো ফেটে পড়ল। ফলে এই ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানরাও মতামত গঠন করার বেলায় সেখান থেকেই সংকেত গ্রহণ করলেন। ইমাম বুখারির মতো ধর্মীয় নেতাও বলে বসলেন যে আয়াতুল্লাহ্-র বাণী ঈশ্বরের বাণী। এই নির্দেশ ভারতীয় মুসলমানের উপকার করে নি।

এদিকে খোমেইনি এভাবে প্রাণদণ্ড ঘোষণা করার অল্পকাল পরেই কিন্তু রিয়াধে অনুষ্ঠিত ৪৬টি মুসলিম রাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রী-সম্মেলনে খোমেইনির ফতোয়াকে ইসলামবিরোধী বলে নিন্দা করা হল। ইরান বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও রুশদীর ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হল না, প্রধানত মিশর ও সৌদি আরবের প্রতিকূলতায়। এই ঘটনাটিকেই সংবাদ হিসেবে এদেশে এবং সর্বদেশের পত্রপত্রিকায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভালো খবরের চেয়ে চাঞ্চল্যকর আর অরুচিকর খবরকে আজও তাবৎ দুনিয়ার সাংবাদিক মহল অনেক বেশি প্রশ্রয় দেন···তাই নিয়ে নাচানাচি করেন এবং পাঠককুলকেও মাতিয়ে তোলেন। এই ব্যাপারেও একটা প্রেশামস্ ল কাজ করে। খবরের কাগজের পাতা থেকে মন্দ খবর ভালো খবরকে হটিয়ে দেয়।

বলা বাহুল্য ধর্মগুরু হলেও খোমেইনি যে তড়িঘড়ি হুঙ্কার ছেড়েছিলেন ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য সেটিও তেমন ধর্মবোধে নয়। নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এবং সারা মুসলিম জাহানে তাঁর হৃতস্থান পুনরুদ্ধারের অভিলাষও ছিল যোলো আনা—একথা সবাই বলেছেন। আবার মুসলিম দেশগুলির পররাষ্ট্র-মন্ত্রী-সম্মেলনে এই ব্যাপারটাকে যে সরাসরি তাচ্ছিল্য করা হল তার পিছনেও রাজনীতিক রেষারেষি ছিল অনেকখানি। সে যাই হোক, তাতে অন্তত ভালো বই মন্দ হয় নি। এদিকে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সদ্দাম হুসেন বলেছেন, রুশদীর বইয়ের চেয়েও ইসলামের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে আয়াতুল্লাহ্-র এই হিংসাত্মক ঘোষণা আর তার অব্যবহিত পরবর্তী শোরগোল। কিন্তু এসব সুবুদ্ধির কথা এদেশে পৌঁছবার আগেই কাশ্মীরে তাণ্ডব হয়ে গেল, বোম্বাইয়ে রুশদীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতে গিয়ে অনেকের প্রাণ গেল।

পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে গলা মিলিয়ে লেখককে প্রাণদণ্ডদানের মতো বর্বরতার যে নিন্দা করবেন ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়—এটা তাঁদের সমগ্র মানসিকতার বিচারে যেমন স্বাভাবিক, ভারতীয়

মুসলমানও যে তা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন এটাও তাঁদের পরিস্থিতির বিবেচনায় তেমনি স্বাভাবিক। আবার এরই ফলে অনেকেরই মনে হচ্ছে যে আধুনিক উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সপক্ষে গেলেন হিন্দুরা এবং মধ্যযুগীয় বৈরতান্ত্রিক-ধর্মতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পক্ষে পড়ে রইলেন মুসলমানরা। পরস্পরের মানসিক দূরত্ব এই কয় মাসে আরো অনেকটা বেড়ে গেল।

অথচ রুশদীর রচনা মুসলমানকে কী ভাবে এবং কত দূর আহত করেছে সেটা হিন্দুরা পুরোপুরি জানেনও না, আপাতত জানবার মতো মনও নেই—কিন্তু জানার প্রয়োজন ছিল। তাই মুসলমানের এহেন ক্ষোভ ও ক্রোধের ঔচিত্যও উপলব্ধি করতে পারছেন না হিন্দু-সম্প্রদায়। হিন্দুধর্ম কোনো একটি শাস্ত্র-নির্ভর নয়। তবু কথায়-কথায় বলা হয়, 'এতে কি বেদ অশুদ্ধ হয়ে গেল?' অর্থাৎ যে কর্ম করলে বেদ অশুদ্ধ হয় তা নিতান্তই গর্হিত ও অকরণীয়। বেদকে অস্বীকার করে যেসব ধর্মের উত্থান ঘটেছিল এদেশে তাদের প্রতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রোষ কোন্ সীমায় পৌঁছেছিল স্মরণ করুন। বৌদ্ধধর্ম পাহাড়, সমুদ্র ডিঙিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। আজকের নববৌদ্ধদের প্রতি হিন্দুসমাজের মনোভাবও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা নয়।

প্রতিতুলনায় ইসলামধর্ম কিন্তু ওই একটিমাত্র শাস্ত্র-নির্ভর। যাঁরা কোরান শরীফকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানেন এবং তাঁদের জীবনচর্যার একমাত্র নিরিখ বলে জ্ঞান করেন তাঁদের যদি হঠাৎ বলা হয় ওটা নিতান্তই শয়তানের উক্তি, তাহলে তাঁদের পায়ের তলা থেকে একেবারেই মাটি সরে যায় না কি? ধর্মকে হারিয়ে সলমন রুশদীর হৃদয়ে শুনেছি একটা ফুটো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ যে একেবারে অতল গহ্বরে পড়ে যান···কুটোটিও ধরবার থাকে না, কোরান শরীফ হারালে। অতএব তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়বেন, এটা কি অপ্রত্যাশিত? কোনো শাস্ত্রই সমালোচনার উর্ধ্বে নয় একথা আমি সর্বান্তঃকরণে মানি বলেই উলটো কথাটাও বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই যে কোনো শাস্ত্রকেই এমন সর্বতোভাবে কলমের এক খোঁচায় বাতিলও করে দেওয়া যায় না। কোন্ শাস্ত্রের কতটা রাখব কতটা ফেলব তার ঝাড়াই-বাছাই যুক্তির কুলো পেতে যদি করা হয় তাতে আমার অন্তত আপত্তি নেই। আমার মনে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে তখনই যখন দেখি যুক্তির জায়গা জুড়ে বসেছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আর অশ্লীল ইঙ্গিত।

কাইরোর এক সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত ইসলামতত্ত্বজ্ঞ অত্যন্ত উদারভাবে আহ্বান জানিয়েছেন যেন রুশদীর বক্তব্যের ভ্রান্তি দেখিয়ে দিয়ে আর-একটি পুস্তক রচনা করা হয়। এ-জাতীয় প্রস্তাব আরো বহু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীও করেছেন। যেহেতু 'ভ্রান্ত মত নিরসনের ওটাই সভ্যজনস্বীকৃত মানবিক পথ'।··· ওই পথেই চিন্তার নানা ধারা পরস্পরকে খণ্ডন ও পূরণ করে এগিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উপাদেয় মত পেশ করেছেন একজন আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী, আলী এ মায্রুই, যিনি এখন কর্নেল ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর মতে রুশদী যেহেতু তাত্ত্বিক প্রবন্ধের বই লেখেন নি, একটি কল্পকথাসম্বলিত উপন্যাস লিখেছেন, তাই তাঁকে যথাযোগ্য জবাব দেবার জন্য আর খ্রীষ্টান বুদ্ধিজীবী মহলের পরমতসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর-একটি উপন্যাস লিখতে হয় :

'The real equivalent of comparative blasphemy would be in portraying the Virgin Mary as a prostitute, and Jesus as the son of one of her sexual clients. Also comparable would be any novel based on the thesis that the twelve apostles were Jesus's homosexual lovers and the Last Supper was their last sexual orgy together. It would be interesting to speculate which ones of the leading writers would march in procession in defense of the "rights" of such a novelist.'

আলবার্তো মোরাভিয়া, আর্থার মিলার, সল বেলো, গ্রাহাম গ্রীন ইত্যাদি হাজারখানেক লেখকের কেউই আলী মাযরুই-এর সঙ্গে বিতর্কে বা উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হয়েছেন বলে শুনি নি। হলেও এহেন বিকার-গ্রস্ত কিন্তু উর্বর মস্তিষ্কের কাদা-ছোড়াছুড়ির ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের যে অপূর্ব বিকাশ দেখা যাবে তার প্রতি আমার কোনো স্পৃহা নেই। আমার যে বন্ধুর সাথে এই নিয়ে মাঝে-মাঝেই তর্কবিতর্ক হয়েছে তিনিও বলেছেন, 'গালাগাল দেওয়া আর সাহিত্য রচনা এক জিনিস নয়। সাহিত্য রচনা একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র।' তবে তিনি হয়তো মানতে চাইবেন না যে রুশদীর রচনার অন্তত ঐ অংশটা গালাগাল, সাহিত্য-রচনা নয়।

কোনো সংশোধনই সম্ভব নয় যখন তাতে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা যুক্ত না হয়—তা ব্যক্তিরই হোক, সমাজেরই হোক বা ধর্মেরই হোক। সমাজদলের হাতিয়ার হিসাবে মার্কসবাদের উত্থান আর পতনএক জন্মেই দেখতে হবে—এ আমাদের অনেকেরই সুদূর-তম কল্পনাতেও ছিল না। বরং আমাদের কিশোর বয়সে এইরকম একটা প্রত্যাশা ছিল যে লোভ মাৎসর্য স্বার্থপরতা, প্রভুত্বকামিতা ইত্যাদি মানুষের স্বভাবে যত মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে তার থেকেও উত্তরণ সম্ভব হবে মার্কসবাদী বিপ্লবের সাহায্যে। এখন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে দেখছি আর যে উপায়েই হোক সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ হলেও এটা আর প্রমাণিত হতে বাকি নেই যে ডাণ্ডা মেরে মনুষ্যচরিত্রের সত্যি-কারের সংশোধন সম্ভব নয়। মনুষ্যত্বের উন্নয়নে সহিংস বিপ্লবের সামর্থ্য কতটুকু তার পরিমাপ করা হয়ে যাচ্ছে বিংশ শতাব্দীতেই—আমাদের চোখের সামনেই। হিংসাত্মক বাক্যই কি লক্ষ্যবেধ করতে পারবে?

তা ছাড়া আমরা আশা করেছিলাম বিজ্ঞান আর মার্কসবাদের কল্যাণে ধর্মমূঢ়তা কিছুটা দূর হবে। বিংশ শতাব্দী এদিক দিয়েও আমাদের স্বপ্নভঙ্গের কাল···সব মোহমুক্তি ঘটে চলেছে দ্রুত। বিজ্ঞানই যখন যুক্তির প্রসারে ব্যর্থ হয়েছে তখন প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক যদি ভাস্তর-ভাদ্রবউয়ের মতো হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অবাক হবার কী আছে? প্রযুক্তির জাদুকাঠির স্পর্শে বহিরঙ্গে যত আধুনিকতা, অন্দর-মহলে কোনো আলো যেন পৌঁছায় না—সেখানে হাজার-হাজার বৎসরের অযৌক্তিক অন্ধকার।

মাঝে-মাঝে কোনো বন্ধু এসে বলেন, 'ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে মুসলমানের অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা কাটিয়ে উঠবার সময় এসেছে একথা স্বীকার করেন তো?' ইসলামের চোদ্দ শত বৎসরের ইতিহাসে কত যে প্রতিবাদী স্বর উঠেছে এবং কেমন করে ধর্ম ও সমাজকে প্রভাবিত করেছে তার আমিই বা কতটুকু জানি যে অন্যকে জ্ঞান দেব! অগত্যা তাঁদের কথা অস্বীকার না করেই প্রশ্ন করি, অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাস বিষয়েও হিন্দুর স্পর্শকাতরতা কতখানি সে খেয়াল আছে কি? ক-জন তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত হিন্দু সন্তান আজও সর্বজনসমক্ষে স্বীকার করতে সাহস করবেন, 'সম্প্রতি আমার পিতা গত হয়েছেন, কিন্তু আমার মাকে আমি নিরামিষ আহার ইত্যাদি কৃচ্ছ্রতা পালন থেকে বিরত করেছি—তিনি মাছ মাংস আহার করেন!' আবার আমার তরুণী সহকর্মিণী অধ্যাপিকাদের মধ্যেও দেখি বিজ্ঞানে উচ্চতম ডিগ্রীধারিণীরাও সন্তোষী মায়ের, লুঠনষষ্ঠীর, শীতলষষ্ঠীর ব্রত পালন ক'রে পরম আত্মসন্তুষ্ট! তা ছাড়া অসংখ্য দীক্ষাগুরু তো আছেনই। এ নিয়ে তর্ক ফাঁদতে গেলে প্রায় মনোমালিন্য ঘটে। এ নাকি ঐতিহ্যে পা রেখে দাঁড়ানোর স্বাস্থ্যকর প্রয়াস। শাহবানুর লাঞ্ছনায় শরীয়তপন্থীদের বহু ধিক্কার দিয়ে-ছিলাম। রূপ কানোয়ার মৃত হলে দিয়ে গিয়েছে আমাকে। সতীপ্রথা-সমর্থক শঙ্করাচার্যদের নববিধানের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন ক-জন বুদ্ধিজীবী? ধর্মের অনন্ত রহস্য অনুধাবনের পর আর তাঁদের অবসর কই? ব্যাপার হচ্ছে সংখ্যাগুরুর গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা, স্পর্শকাতরতা অনেক বেশি ব্যাপ্ত বলেই

চোখে সেগুলি স্বাভাবিক লাগে আর সংখ্যালঘুরটা এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাঝে-মধ্যে দেখতে পাই বলে চোখে বড়ো বেমানান ঠেকে।

আবার হিংসার কথাতেই ফিরে আসি। আমাদের পলকা সাম্প্রদায়িক শান্তি পাছে ভেঙে পড়ে এই ভয়ে ভারত সরকার "গু সেটানিক ভার্সেজ"কে নিষিদ্ধ করেছেন এবং কারণটাও অকপটে স্বীকার করেছেন এটা ভালো। এই সাবধানতাকে সরকারের অহেতুক ভীরুতা যাঁরা মনে করেন তাঁরা তর্কের খাতিরে এই কথাও বলেছেন, 'কই, এত করেও কি সংখ্যালঘুর মন পাওয়া গেল? হি সাকে ঠেকানো গেল কাশ্মীরে? বোম্বাইয়ে?' প্রথমত বলব, হ্যাঁ পাওয়া গিয়েছে, সরকারের এই সময়োচিত সাবধানতায় মুসলমান সমাজ সত্যিই সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার কাশ্মীর কি বোম্বাইয়ে যারা রাজনৈতিক ফায়দা করে নেবার চেষ্টা করেছিল এই সুযোগে, তাদের আন্দোলনকেও শক্ত হাতে দমন করবার নৈতিক অধিকারও সরকার সেজন্যই অর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একদল বিরক্ত এই কারণে যে আদৌ ভারতবর্ষে কোথাও কোনো প্রতিবাদ উঠল কেন—আগেভাগে বইটাকে ঠেকিয়েও দাঙ্গাকে ঠেকানো গেল না কেন! এঁরা বুঝেও না বোঝার ভান করছেন যে বইটি নিষিদ্ধ না করলে এইরকম দাঙ্গা সারাদেশব্যাপী হবার আশঙ্কা ছিল যা সামলানো সত্যিই কঠিন হত সরকারের পক্ষে। আর সাবধান হওয়া সত্ত্বেও যদি ছোটোখাটো অপঘাত ঘটে থাকে তবে তার দোষ সাবধানতায় বর্তায় না। কোনো যুক্তিতেই বলা যায় না যে এত অতিরিক্ত সাবধান না না হলে এমনটাও ঘটত না।

এর বিপক্ষে একদল বলছেন, ভারতবর্ষে এই বই নিষিদ্ধ হয়েছে তো কী হয়েছে, সারা বিশ্বে তো হয় নি। যেসব দেশে হয় নি সেসব দেশের বিরুদ্ধে··· অন্তত তাদের দূতাবাসের সামনে প্রতিবাদ জানাবার গণতান্ত্রিক অধিকার ভারত সরকারের দেওয়া উচিত ছিল। আমি বলব, ছিল না। যে বড়ো অশান্তির আশঙ্কায় ভারত সরকার অধিকাংশ নাগরিকের এই বইটি পড়ার অধিকার হরণ করেছেন, ঠিক ওই যুক্তিতেই কিছুসংখ্যক নাগরিকের প্রতিবাদ জানাবার এই গণতান্ত্রিক অধিকারও হরণ করাটা অনৈতিক হয় নি বলেই আমি মনে করি। সরকারের যেমন দায়িত্ব আছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমনতর সব প্ররোচনাকে ঠেকানো, তেমনি বোম্বাইয়ে যাঁরা প্রতিবাদ করার পরিকল্পনা করছিলেন তাঁদেরও ভাবা উচিত ছিল যে এই প্রতিবাদ অশান্তির সুযোগসন্ধানী-দের কতখানি প্ররোচনা জোগাতে পারে। শিবসেনা আর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের ঘাঁটিতে বসে আগুন নিয়ে খেলা কি শুধুই নির্বুদ্ধিতা, না অন্য কিছু?

হিংসার কথাটা সারা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতেও ভাবা দরকার। মুসলমান সমাজের কেউ-কেউ মনে করেন খোমেইনির এই হুমকিতে খুব কাজ হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে সবিনয়ে আবেদন-নিবেদন করেও মুসলমান সমাজ সুবিচার বা সমাধান পান নি। কারণ খ্রীষ্টান আর মুসলমানের রেষারেষি সেই ক্রুসেডের কাল থেকেই চলছে। তাই মুসলমানের প্রতি তাদের বিদ্বেষ অবজ্ঞা আর ঈর্ষার মূল আছে বহু গভীরে। খ্রীষ্টান দেশগুলি এখন সলমন রুশদীকে ভালো হাতিয়ার পেয়েছে মুসলমানদের হেনস্থা করবার জন্য। তাই এই সুযোগ তারা ছাড়বে কেন? রুশদীর বই ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ করা কিংবা ইংল্যাণ্ডের ধর্ম-দ্রোহিতা আইনের আওতা একটু প্রসারিত করে ইসলাম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মেরও স্পর্শকাতর দিক-গুলিকে রক্ষা করার আবেদনে ব্রিটিশ সরকার কর্ণপাত করেন নি। এই পরিস্থিতিতে খোমেইনির হুমকিতেই তবু কিছুটা সংযত হয়েছে লেখক প্রকাশক বিক্রেতারা! শুধু ইংল্যাণ্ডে কেন, কোথাওই বইটা খোলাখুলিভাবে বিক্রি করতে সাহস করছে না খোমেইনির অনুসারীরা দু-চার জায়গায় বোমা ফেলার পর এবং বোমা ফেলা হবে এই ভয় দেখানোর পর থেকেও।

এই যুক্তি মনকে বড় বিষণ্ণ করে। আয়াতুল্লাহ-র হুমকির আওতায় তো অসংখ্য মানুষ এসে পড়ছে ক্রমেই—শুধু রুশদী, তাঁর প্রকাশক আর বিক্রেতারাই নয়। বেলজিয়ামের সবচেয়ে বড় মসজিদের টিউনিসীয় ইমাম এবং তাঁর সৌদী আরবীয় সহকারীকেও ব্রাসেল্‌সের মসজিদেই হত্যা করা হয়েছে যেহেতু ঐ ইমাম দূরদর্শনের কোনো অনুষ্ঠানে নাকি বলেছিলেন যে খোমেইনির প্রাণদণ্ড দেওয়ার হুমকি অনুচিত কাজ হয়েছে। সুইডেন-প্রবাসী এক পাকিস্তানি যেহেতু ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বইখানা উর্দু-ভাষায় অনুবাদ করা স্থির করেছেন তাই তাঁকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে তাঁর মালয়শীয় প্রতিবেশীকে হত্যা করা হল সম্প্রতি স্টকহোমে। এসব কি সমর্থন করা যায়? চোখ রাঙিয়ে, মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে সত্যিই কি কোনো ভাবনাকে ঠেকানো যায়? বরং ওতেই তো প্রতিস্পর্ধা বাড়ে। এই কারণেও যাঁরা মৃত্যু বরণ করবেন তাঁরাও তো অন্য পক্ষের শহীদ হবেন। রুশদী যদি নিহত হন তাহলে বাক্-স্বাধীনতার মহৎ আদর্শের জন্য তিনি আত্মবলিদান করলেন বলে তাঁকে আরও বেশি সম্মান দেওয়া হবে, তাঁর বই আরো বহু মানুষ বহুকাল ধরে পড়বেন। মোটেই সে-সব পুড়িয়ে ফেলা হবে না।

তা ছাড়া, হত্যা আর হিংসার একচেটিয়া এক্তিয়ার কি শুধু মুসলমানেরই আছে? অন্যরা কি নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়েই থাকবে? লনডনের বৃহত্তম মসজিদে বোমা ফেলেছিল এক যুবক ২২শে ফেব্রুয়ারিতে। এই সাইপ্রাস-দেশীয় যুবকটি এখন ইংল্যাণ্ডের নাগরিক। সে নাকি আদালতে অপরাধ স্বীকার করে বলেছে যে স্বাধীনতা হরণ করার জন্য যারা হত্যার ভয় দেখাচ্ছে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এটি স্বাধীনতার সপক্ষে তার লড়াই। বিচারপতি অবশ্য তাকে বুঝিয়ে বলেছেন যে হিংসার জবাবে আরো হিংসা করলে স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায় না—তাতে কেবল অরাজকতা বাড়ে।

কেউ-কেউ রুশদীর প্রাণদণ্ড বিষয়ে কাব্য করে বলেছেন, যে-তীর ছোঁড়া হয়ে গিয়েছে, তাতে রুশদীর নাম লেখা আছে। একদিন না একদিন কোথাও না কোথাও ওই তীর তাঁকে বিদ্ধ করবেই। ব্রিটিশ পুলিশের সাধ্য নেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, মরতে তাঁকে হবেই। এই প্রত্যাশায় যাঁরা পুলকিত হচ্ছেন তাঁদের কাছে নিবেদন করি, সলমন রুশদীর যেদিন ঘাতকের হাতে মৃত্যু হবে সেই দিনটা মুসলমানের গর্ব করার নয়, লজ্জা পাবার দিন হবে। সব অমুসলমানের চোখে সেদিন তারা খানিকটা নীচে নেমে যাবে। কোনো মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়—শক্তি থাকে তার উদার মানবিকতায়। হজরৎ মহম্মদের জ্যোতি এবং ইসলামের মাহাত্ম্য আপন শক্তিতেই চিরস্থায়ী হবে। এমন দুর্দিন কি সত্যিই এসেছে যে ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষের কীর্তিকে রক্ষা করবার জন্য ভাড়াটে ঘাতকের প্রয়োজন হবে?

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-৯৪) ও পারীর নীচের মহল

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

বিশ্ববিপ্লবের মানচিত্রে ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) ধ্রুপদী মর্যাদায় ভূষিত এবং তারি সঙ্গে সংসাধিত ইতিহাসের নিয়ামক শক্তিরূপে আটপৌরে সাধারণ মানুষের অভিষেক। ফরাসি ঐতিহাসিক লুই মাদেলিনের ভাষায়, এই বিপ্লব আসলে মানুষের মহত্তর অনুভূতির বিস্ফোরণ ও প্রতিহিংসা।

কেন এই বিপ্লব, এবং কিভাবেই বা তার সূত্রপাত? তার উত্তরে বলা যেতে পারে: শতাব্দীব্যাপী বহু মনীষীর সাধনার পরিণতি হয়তো এই বিপ্লবের পশ্চাৎপট। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার আলো মানুষের ভেতরের অন্ধকারকে ধীরে-ধীরে ভেদ করেছে—প্রসারিত করেছে তার মনের আকাশ। তার পাশা-পাশি যুগসঞ্চিত বৈষম্য-বঞ্চনা-ক্ষোভ যেন ঈশান-কোণে পুঞ্জিত রক্তমেঘ। তারপর সেই মেঘ একদিন কালবৈশাখীতে রূপান্তরিত। সশব্দে আছড়ে পড়ল জরাজীর্ণ অচলায়তনের উপর ঝড়ের প্রবল মাতন।

কার্লাইলের মতে কিন্তু প্রতিবাদী দর্শন নয়, ক্ষুধা আর নগ্নতার রূঢ় বাস্তবতাই বিপ্লবের প্রকৃত কারণ। অর্থাৎ মহানায়ক বা কিংবদন্তী পুরুষ নয়—পাদপ্রদীপের আলোয় সমুপস্থিত নামহারা, পরিচয়-হারা অগণিত মানুষ। তারা ক্ষুধার্ত, তারা শীতার্ত—এবং তারাই ফরাসি বিপ্লবের প্রকৃত নায়ক।

না, বিপ্লব তারা শুরু করে নি। রোবস্পীয়ের মনে করেন, বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায় অভিজাত সম্প্রদায় —মাননীয় বিচারকমণ্ডলী, ধনিক ও বণিক সম্প্রদায়। কিন্তু নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে সাধারণ মানুষের আবির্ভাব। তারপর প্রবল জলোচ্ছ্বাস—যার গতিরোধ করা কারো সাধ্যাতীত।

খুব অল্প কথায়, সাতুব্রিয়াঁ বলেন—বিপ্লব প্রথমে শুরু করে প্যাট্রিসিয়ানরা, পরে প্লিবিয়ানরা এসে তাকে অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। জনগণের সহযোগিতা অবশ্য কাম্য ছিল—বেসামাল বল্গাহীন গণ-অভ্যুত্থান নিশ্চয় বুর্জোয়াদের অভিপ্রেত ছিল না।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিধা-যুক্ত এই

বিপ্লবের আসল পাত্রপাত্রীদের চিনতে ভুল করেন নি ঐতিহাসিক কোবান। তাঁর সঙ্গত প্রশ্ন : কারা বাস্তিল পোড়াল? ভার্সাই অভিযান করল কারা? কারাই বা জমিদারের কাছারি, মহাজনের গদি পুড়িয়ে ছারখার করল? ১৭৮৯-এর বসন্তকাল থেকে ১৭৯৪-এর বসন্ত পর্যন্ত একের পর এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করল কারা?

নিশ্চয় বুর্জোয়ারা নয়—যারা বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। তারা সমাজের নীচুতলার মানুষ—কারিগর, মিস্ত্রী, দোকানদার, কৃষক আর সৈনিক। (প্রসঙ্গত, ১৭৮৯-এর অগস্ট-সেপটেমবরের পর গ্রামের চাষীদের সঙ্গে আর বিপ্লবের সম্পর্ক নেই। বরঞ্চ ব্রিটানি আর ভেণ্ডী অঞ্চলে তারা পরবর্তী কালে বিপ্লবের সক্রিয় বিরোধিতায় শামিল।)

বিপ্লবের এই মশালচিদেরই একজন দিনমজুরের বউ শালাঁদ—যে চেয়েছে প্রতিটি ধনীর বাড়ির দরজায় গিলোটিন বসুক। না হলে গরিবের সুরাহা হবে না। ছাপোষা ঘরামি যোশেফ মার্লৎ। অত্যন্ত ভালো মানুষ। বিপ্লবের আঙিনায় কিন্তু হিংস্র। রিচার একজন ছুতোর। সে মনে করে, সস্তায় রুটি পেতে হলে একটু রক্ত ঝরবেই। প্রতিবেশীদের চোখে মুচি হ্যভাল একজন আদর্শ স্বামী, একজন স্নেহপ্রবণ পিতা। অথচ লড়াইয়ের সময় সে বেপরোয়া। নিরীহ স্কুল মাস্টার ম্যুসার্দ বিপ্লবের দামামা বেজে উঠলে স্থির থাকতে পারে না। মানুষের মঙ্গলের জন্যে সে শত্রুর টুঁটি টিপে ধরতে চায়।

গির্জায় গির্জায় ঘণ্টা বাজছে—আপৎকালীন সঙ্কেত। দিকে-দিকে শত-সহস্র কণ্ঠে হুঙ্কৃত শ্লোগান। ভেরীতে বেজে ওঠে রণবাদ্য। তখন এরা কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারে না। আঘাত হানে স্বৈরতন্ত্রের দুর্গে। এভাবে উঠে আসে নায়কের আসনে অজানা অনামা মানুষের দল—যাদের অষ্টাদশ শতকের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার কথা।

দুই

তখনো পারি শহরে পুরোদস্তুর শ্রমিক মহল্লা গড়ে ওঠে নি। কতকগুলি অঞ্চলে অবশ্যি বাসাবাড়ি দেখা যেত, সেখানে মাঝিমাল্লা মুটেমজুর—সব গাদাগাদি করে রাত্রিবাস করত। এক সিকি থেকে চার সিকি ছিল এক রাত্তিরের ভাড়া। বাস্তিলের উপর চড়াও হবার জন্যে এসব বাড়ি থেকে ওস্তাদ কারিগর আর তাদের সাকরেদরা বেরিয়ে পড়েছিল। রুগুলাপ, সঁ্যাতাতোয়ান, রুগু লোম্বার আর রুসঁ্যাদানির রাস্তায় এসব মেহনতি মানুষের বাসস্থান। তা ছাড়া, সমগ্র এলাকা জুড়ে চলে পাইকারি আর খুচরো বেচাকেনা। কুটিরশিল্পীদের প্রধান আড়ত। দু-একটা ভাঁটিখানা এবং কাচের কারখানাও রয়েছে, যেখানে পাঁচশো লোক একত্রে কাজ করে। ঘর সাজাবার সামগ্রী আর ঘরের পরদা তৈরির আড়তও এসব মহল্লায়।

সঁ্যাতাতোয়ান মহল্লাটির গণবিক্ষোভের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। পুলিশের খাতায় এখানকার বাসিন্দারা পাঁচমেশালি অথচ বেপরোয়া বলে চিহ্নিত। যেমন এখানকার কুড়ি হাজার তাঁতি ১৭৯১ সালে আইন-সভার কাছে যন্ত্রচালিত তাঁতের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে দরখাস্ত করে। বিপ্লব চলার সময় দেখা যায়, ফবুর্গ সঁ্য মার্সেল, সঁ্যা জাক, সঁ্যা ভিক্তর মহল্লার লোকজনও কম যায় না। এসব অঞ্চলে চর্মশিল্প একটি প্রধান শিল্প। ১৭৯১ সালে সরকারি সূত্রে জানা যায়, এক-একজন মালিক এক ডজনের মতো কারিগর খাটাচ্ছে। তা ছাড়া আছে কাপড় তৈরি আর কাপড়ে রঙ লাগানোর পেশায় নিযুক্ত লোকেরা। মজুরি-ওয়ালাদের এক-তৃতীয়াংশ আবার গৃহ-নির্মাণের কাজে নিযুক্ত। তারা বেশির ভাগই বহিরাগত আর ঋতু-ক্রমিক শ্রমিক।

পারীর এই মহল্লাগুলিতে শহরের দরিদ্রতম লোকের বাস। মার্সিয়ের লিখছেন : এখানে রাস্তার ধারে-ধারে সরাবের দোকান। মদ চলছে সমানে।

লোকগুলো যেন সাতদিনের সরাব একদিনেই গিলছে। তারা ভয়ঙ্কর ঝগড়াটে—সহজেই খেপে ওঠে। অন্যান্য মহল্লার তুলনায় এসব পাড়া বেশি বিদ্রোহপ্রবণ।

পারীর পুরসভার হিসেবে (১৭৯১), পোষ্যবর্গ-সহ শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা অনধিক তিন লক্ষ। আধুনিক শিল্পশ্রমিক এদের বলা চলে না। শিল্প-শ্রমিকের খোঁজে যেতে হবে মার্সাই, লিয়ঁ আর বোর্দো। আশি হাজার মজুর যেখানে কাজ করে সাবানের আর চিনির কলে এবং জাহাজনির্মাণশিল্পে। স্পিনিং জেনির সংখ্যা নয় শ। অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছে। তাই কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্পও গড়ে উঠেছে। যেমন অর্লিয়াঁসে দেখা যায়, দু হাজার শ্রমিক একটিমাত্র কারখানায় কর্মরত।

ফরাসি বিপ্লবে এদের ভূমিকা কিন্তু নিতান্তই গৌণ। পারীর শ্রমজীবী মানুষ প্রধানত ছোটোখাটো কারখানা বা কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তারা 'উভ্রিয়ে' বলে পরিচিত, এবং ভদ্রলোকের চোখে তারা ছোটো-লোক বা 'মেনু প্যপ্‌ল' (menu peuple)। মালিক শ্রমিক একই ঘরে খায় আর শোয়। মজুরিওয়ালা কারিগর আর স্বাধীন কারিগরের সীমারেখা অত্যন্ত ক্ষীণ।

১৭৮৯ সালে একজন পারী-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি :

—একজন সাধারণ শ্রমিকের —২০ বা ৩০ স্যু
—একজন রাজমিস্ত্রীর —৪০ স্যু
—একজন ছুতোর বা তালামিস্ত্রীর —৫০ স্যু

অধ্যাপক লাব্রুসের মতে, অষ্টাদশ শতকে একজন সাধারণ শ্রমিকের দৈনিক রোজগারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চলে যেত রুটির পেছনে। দিনমজুর আর নিম্ন-আয়ের লোকজনদের কাছে রুটির দামের স্থিরতা একটা বড়ো ব্যাপার। চার পাউনড ওজনের একটা রুটির দাম সচরাচর ৮ অথবা ৯ স্যু। তার দাম হঠাৎ বেড়ে (যা বারে-বারে ঘটেছে) ১২ অথবা ১৫ স্যু-তে গিয়ে ঠেকলে বেশিরভাগ মজুরিওয়ালার পক্ষে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসত। তখন তাদের মাথায় খুন চড়ে যেত। রক্তপাত ঘটাতে তারা কসুর করত না।

রুটির দামের বাড়া-কমার সঙ্গে বিপ্লবের তেজি-মন্দার সম্পর্ক ওতপ্রোত। ১৭৯০ সাল আপেক্ষিক-ভাবে ঘটনাহীন—যেহেতু রুটির দাম স্থিতিশীল। আবার বিপ্লবের আওতায় ১৭৯৩ সাল একটি হিংসাত্মক বছর—যেহেতু সব নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম ১৭৯০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ। আসলে, সব অসন্তোষ, সব অশান্তির মূলে ক্ষুধা—সর্বব্যাপী ক্ষুধা।

তারপর রক্তরাঙা পথ ধরে বিপ্লবের সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমা।

তিন

১৭৮৮ সাল। গ্রামে অজন্মা-মড়ক। সে কারণে ঘটেছে গুরুতর ফসলহানি। দলে-দলে লোক শহরমুখী এবং ফলে পারীর বেকারদের সংখ্যায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি। দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট যখন চরমে তখনি কিন্তু ঘটেছে স্টেটস জেনারেলের নির্বাচন। রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গে যেন তাল রেখে বাজার থেকে রুটি উধাও। রুটিসন্ধানী দুঃস্থ মানুষ তখন বিপ্লবের জ্বালানি।

এই পটভূমিকায় স্টেটস জেনারেল গরিবদুঃখীদের কাছে এক ঐশী শক্তি নিয়ে আবির্ভূত। এবার তাদের সব দুঃখকষ্টের প্রতিকার হবে—তারা সুখের মুখ দেখবে। লেফেভ্রের মতে, প্রথম পর্যায়ে তাই ফরাসি বিপ্লব অতীতের ধর্মান্দোলনগুলির সঙ্গে তুলনীয়। হর্ষোৎফুল্ল মানুষ মর্ত্যের মৃত্তিকায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রতীক্ষারত। এই বিশ্বাস যাবতীয় গণোন্মাদনার উৎস। তাই ফরাসি বিপ্লবের আঙিনায় এত ক্রোধ আর জ্বালার উদ্‌গিরণ। বিপ্লব তাই এত বিচিত্রপথগামী।

১৭৮৯-এর বসন্তকাল। বিপ্লব এবং ভলতেয়ার-রুশো সেদিন সমার্থক, আর "বিপ্লব" শব্দটি শৌখিন দর্শনচর্চার আসরে সোৎসাহে উচ্চারিত। প্রসঙ্গত, পরবর্তী কালে রাজা ষোড়শ লুইকে বন্দী অবস্থায়

ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে বলতে হয়েছিল, 'ভলতেয়ার আর রুশোই ফ্রান্সের সর্বনাশ করেছে।' কিন্তু মনীষীরা তো যুগের প্রতিভূ।

অতএব, 'Tiers E' Tat' বা তৃতীয় বর্গ, 'la nation', 'মানুষের অধিকার ও মুক্তি'—কথাগুলি সেদিন হাওয়ায়-হাওয়ায় ঘুরছে-ফিরছে। যারা এত-দিন মুখ বুজে শুধু পড়ে-পড়ে মার খেয়েছে, তারা সেদিন প্রতিরোধ আর প্রতিবাদের নবচেতনায় আপ্লুত। এবং যুগসঞ্চিত বঞ্চনা যখন প্রতিকারের রাস্তা খুঁজছে, তখনই স্টেটস জেনারেলের আসন্ন অধিবেশনের ঘোষণা-বাণী পারীবাসীর মনে জ্বালিয়ে দিল এক নতুন আশার আলো।

ঠিক এই পটভূমিতে ঘটল প্রথম বিস্ফোরণ। ২৩ এপ্রিল—কারখানার মালিক র‍্যাভেঙ্গঁও স্যাঁ মার্গারিৎ মহল্লায় এক বক্তৃতায় আক্ষেপ করে বলে : এক সময় ১৫ স্যু দিলেও চলত। আর এখন ২৫ স্যুতেও কাজ পাওয়া যায় না। শ্রমিকদের কাছে মালিক ভদ্রলোকটি সদাচারী বলে এতদিন পরিচিত ছিল। কিন্তু তার এই অসতর্ক উক্তি সৃষ্টি করল এক প্রবল গণবিক্ষোভ। ফরাসি বিপ্লবের প্রথম গণবিস্ফোরণ। ভয়ঙ্কর উত্তেজনা সাঁতাতোয়ান পল্লীতে। ওই মালিকের কারখানার উপর হামলার পর হামলা, এবং মহল্লা জুড়ে মিছিলের পর মিছিল। পরে দাঙ্গাহাঙ্গামার 'অপরাধে' গিলবার্ট আর পুরাৎ নামে দুই শ্রমিককে ফাঁসিতে লটকানো হয়।

তারপর একের পর এক ঘটনা এবং ঘটনাপ্রবাহের চূড়ান্ত পরিণতি : বাস্তিলের পতন।

দৃশ্যপট দ্রুত বদলাচ্ছে। ২২ জুন জনপ্রিয় মন্ত্রী নেকারের পদচ্যুতির সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তায়-রাস্তায় উত্তেজিত জনতার ভিড়। জনতা এবার সশস্ত্র। কামারশালায় রাতদিন তৈরি হচ্ছে নানা হাতিয়ার—বর্শা, ছুরি, তরবারি। ফৌজি ছাউনিতেও বিলি হচ্ছে উত্তেজক প্রচারপত্র। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্যে আবেদন জানানো হয় সৈন্যদের প্রতি।

১০ জুলাই আঁভালিদ্ ব্যারাক থেকে পালিয়ে আসা আটজন গোলন্দাজকে সাঁজেলিজে-তে সংবর্ধনা জানানো হল।

ইতিমধ্যে দোকানদার আর সাধারণ ক্রেতাদের চক্ষুশূল চেকপোস্টের প্রতিবন্ধকগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

১২ জুলাই রাত। জনতা হাতিয়ারের সন্ধানে স্যাঁৎ লাজারের মঠে হানা দিয়েছে। ওই দিন পারীর গরিব মানুষ ৫২টি গাড়িভরতি খাদ্যশস্য মহাজনের কবল থেকে ছিনিয়ে এনে খোলাবাজারে ন্যায্য দরে বিক্রি করেছে।

১৩ জুলাই। সারাদিন জনতা অস্ত্রের সন্ধানে ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, বন্দুকের দোকান, কামারশালা—সর্বত্র হানা দিয়েছে।

১৪ জুলাই। অবশেষে বাস্তিলের উপর হানাদারি। শহরের পূর্বাঞ্চলের যাবতীয় শ্রমিক-মহল্লা আর ফবুর্গ সাঁতাতোয়ানের কারখানাগুলিকে যেন বাস্তিলের ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি দিনরাত বিদ্ধ করছে। পারীবাসীকে ভীতিবিহ্বল করাই এই দুর্গের আসল কাজ; কারাগার হিসাবে বাস্তিলের গুরুত্ব তখন নিতান্তই গৌণ। বাস্তিলের পতনের ফলে মুক্ত হয় মাত্র সাতজন বন্দী, এবং নিহত কারারক্ষক আর কারারক্ষীর সংখ্যাও সাত। বাস্তিল অভিযানকারীদের মধ্যে পরবর্তী কালে ন শ জনকে শনাক্ত করা হয়। তাদের পেশাভিত্তিক পরিচয় : ৪ জন বণিক, ৩ জন নৌবিভাগীয় অফিসার, ৬১ জন পদাতিক আর ১৫ জন অশ্বারোহী। বাকিরা সবাই দিন-আনি-দিন-খাই মজুর। একজন শুধু নারী—যার নাম মারি শাপতিঁয়ে।

বাস্তিল পতনের সামরিক গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর, নৈতিক ফলাফলই মুখ্য। ভার্সাই রাজপ্রাসাদে সমস্ত শুনে রাজা ষোড়শ লুইয়ের মন্তব্য : এ যে বিদ্রোহ। সংবাদদাতা সভাসদটির ঝটিতি উত্তর : না, এর নাম বিপ্লব।

চার

বিপ্লব ঘটিয়েছে পারীর শ্রমজীবী মানুষ—সাঁকুলোৎ-শ্রেণী। বিদ্রোহের মেজাজ যেন গ্রাস করেছে গোটা শহরকে। অভ্যুত্থানের শীর্ষে দেখা যাচ্ছে আড়াই লক্ষ সশস্ত্র শহরবাসীর উপস্থিতি—তার সিংহভাগ কারিগর, মিস্ত্রী, দিনমজুর, খুদে দোকানদার। অপরদিকে বিদ্রোহী পারীকে শায়েস্তা করার জন্যে ভার্সাইয়ে রাজার অনুগত সেনাবাহিনী সমবেত। প্রত্যাঘাত আসন্ন, অতএব জুলাইয়ের ঝোড়ো দিনগুলিতে গড়ে উঠল, শহরের ষাটটা মহল্লা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বিকল্প ক্ষমতাকেন্দ্র। ওতেল-দ্য-ভিল বা পারীর টাউন হল তার সদর দপ্তর। গড়ে উঠেছে জাতীয় রক্ষী-বাহিনী—যার কাজ শহরে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা।

দুর্বহ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন। রুটির আকাল। কাজ কামাই করে রুটির লাইনে দাঁড়িয়ে শহরের গরিব মানুষ। তাদের মজুরি কাটা যায়। ধৈর্যের বাঁধ যায় ভেঙে আর মাথায় খুন চাপে। এবার মেয়েরা এল এগিয়ে। পুরুষ-মানুষ রুটির সমস্যা কী বোঝে! অতএব আমাদের হাত লাগাতে হবে—মেয়েরা বলাবলি করে।

১৬ সেপটেমবর। শোইয়ো-তে পাঁচখানা খাদ্য-শস্য-বোঝাই গাড়ি আটক ক'রে মেয়েরা ওতেল-দ্য-ভিলে নিয়ে আসে।

১৭ই দুপুরে রুটিওয়ালাদের বেয়াড়াপনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে মেয়েরা ওতেল-দ্য-ভিল ঘেরাও করে।

১৮ সেপটেম্বর। ওতেল-দ্য-ভিল আবার ঘেরাও। প্লাস দ ত্রোয়া মারি-র কাছে মেয়েরা আবার খাবার-বোঝাই গাড়ি আটক করে।

৫ অকটোবর পর্যন্ত এরকম চলতে থাকে। ৬ অকটোবর মেয়েরা ভার্সাই থেকে রাজপরিবারকে সঙ্গে করে পারীতে ফিরিয়ে আনে। ১৪ জুলাই রাজা জনতার কাছে হতমান—৬ অকটোবর পরাজিত। এটা ধরে নেওয়া হয় যে, পারীতে রাজার উপস্থিতি মানেই অঢেল রুটি। এই প্রত্যাশা কিন্তু বাস্তবায়িত হয় নি। সঙ্কট চলল আরো এক মাস। রাজার প্রত্যাবর্তনের পরের দিনই শস্যের বাজারে হানা দিয়ে মেয়েরা ১৫০ বস্তা পচা ময়দা উদ্ধার করে। তার কিছু নমুনা রাজাকে দেখিয়েই তারা সেগুলি নদীতে ফেলে দেয়।

২১ অকটোবর। ওতেল-দ্য-ভিল এলাকায় রুটি নিয়ে ফের হাঙ্গামা বাধে। রুটিওয়ালা ফাঁসোয়াকে এক ল্যাম্পপোস্টে লটকে দেওয়া হয়।

পরের দিন 'rue Thibault-au-de' বড়ো-বাজারের কাছে মেয়েরা আবার হাঙ্গামা বাধায়। তারা লুকানো গম ময়দা তল্লাসি করতে চায়।

কিন্তু জাতীয় সভা আর 'মেনু প্যপ্‌ল' বা ইতর জনতার হাঙ্গামাপ্রিয়তা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। অভ্যুত্থানের আর প্রয়োজন নেই। ২১ অকটোবর নতুন নির্দেশ জারি হল। 'বিদ্রোহী'র সাজা মৃত্যুদণ্ড। ঘোষিত হল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আর সামরিক আইন। স্বাধীনতার দলন শুরু এবং তার প্রথম বলি বাস্তিলজয়ী শ্রমিক মিশেল আদ্রিয়েন। ফবুর্গ সাঁতাতোয়ানে 'রাজদ্রোহ' উশকে দেবার 'অপরাধে' তাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হল।

১৪ জুলাই, ১৭৯০। বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী সাঁজে মারে-তে ধুমধাম করে প্রতিপালিত। বিপ্লব শেষ। ইতিমধ্যে রুটির দাম বেশ কয়েকমাস যাবৎ ১২ স্যু তে স্থিতিশীল।

পাঁচ

বিপ্লব শেষ। অন্তত ফরাসি বুর্জোয়াশ্রেণী তাই মনে করে। তারা এখন বিপ্লবের সুফল ভোগ করতে উৎসুক—অবশ্যি যদি রাজা, আমির-ওমরাহ, যাজক ও অভিজাতশ্রেণী বাদ না সাধে। কিন্তু ইতিমধ্যে একের পর এক কৃষক-অভ্যুত্থান সামন্ততন্ত্রের কবর রচনা

করেছে। জমিদারের গায়ে আজ হাত পড়েছে—কাল টানাটানি পড়বে শহুরে বিত্তবানদের সম্পত্তি নিয়ে। বুর্জোয়াশ্রেণী অতিশয় উদ্বিগ্ন। তাদের অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

তার কারণ, পারীর শ্রমজীবী জনতা এবার গ্রামের কৃষকের পথে পা বাড়াতে চলেছে। তারা কেন বিপ্লবের সুফল থেকে বঞ্চিত হবে? তাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা আর ধর্মঘট করার অধিকার সমার্থক।

১৭৯১ সালে দৃশ্যপট আমূল পরিবর্তিত। বিভিন্ন শিল্প আর পেশায় কর্মহীনদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৭৯১ সালের গোড়ায় বেকারভাতা পাচ্ছিল চব্বিশ হাজার কর্মহীন মানুষ—জুনে সে সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় তিরিশ হাজারে। গৃহভৃত্য, কারিগর, শিক্ষক, শিল্পী, ভাস্কর—সবাই বেকারভাতার প্রার্থী, দৈনিক কুড়ি স্যু করে ভাতা মিলত। জুনের মাঝামাঝি সেই ভাতা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলে বেকার শ্রমজীবীদের পক্ষ থেকে আইনসভার কাছে তিনটি দরখাস্ত পেশ করা হয়। যার সারমর্ম: যেভাবেই হোক, বুভুক্ষু মানুষকে রুটি দিতে হবে।

তার পাশাপাশি শুরু মজুরিবৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন।

এপ্রিল, ১৭৯১—দৈনিক পঞ্চাশ স্যু মজুরির দাবিতে ছুতোরমিস্ত্রীরা আন্দোলন শুরু করে। তাদের সঙ্গে শামিল হয় টুপির কারখানা আর ছাপাখানার শ্রমিক। মে মাসে গড়ে তোলে ছুতোররা নিজেদের সংগঠন। জুনে স্যাঁৎ জেনেভিয়েভ চার্চ নির্মাণরত ৫৬০ জন শ্রমিকের এক চিঠি মারাটের কাগজ "লামি দ্যু প্যপল্"-এ ছাপা হয়। জ্বালাময়ী ভাষায় চিঠিখানি লেখা। গড়ে ওঠে বেকার আর ফুরনে-খাটা মজুরদের স্বতন্ত্র আন্দোলন। সমস্ত খেটেখাওয়া মানুষ মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলনে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। এত বড়ো সর্বাত্মক আন্দোলন ১৭৯৪ সালের আগে দেখা যায় নি।

১৭৯১ সালের জুনে ৮০ হাজার পারী-শ্রমিক আইনসভার কাছে এক গণ-দরখাস্ত পেশ করে। তার পরিণতি: আন্দোলন ও সংগঠন নিবারক আইন। আইনসভার সদস্য লে শাপেলিয়ে-র প্রস্তাবক্রমে শ্রমিকের সবরকম সংগঠন নিষিদ্ধ হয়। এমন-কী সভা-সমাবেশ এবং আবেদনপত্র রচনাও বে-আইনি। এই সর্বাত্মক শ্রমিকবিরোধী আইন পরবর্তী কালে যখন জ্যাকোবিন দল ক্ষমতাসীন তখনো বলবৎ। প্রায় এক শ বছর পরে ১৮৮৪ সালে এই আইন রদ করা হয়।

এভাবে শঙ্কাতুর বুর্জোয়াশ্রেণী নীচুতলার মানুষের হামলা থেকে বিপ্লবকে যখন সুরক্ষিত করার কাজে ব্যস্ত—এদিকে তখন বিপ্লববিরোধী চক্রান্তের মহড়া শুরু হয়েছে ওপরতলায়।

১৭৯১-১৭৯২-১৭৯৩। বছরগুলি নিয়ে এল ঝোড়ো হাওয়ার মাতন। এক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে গেল সবকিছু—পুরাতন সবকিছু—রাজতন্ত্র-জমিদারতন্ত্র-যাজকতন্ত্র। দেশ আর জাতি যেন এক পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার। একের পর এক বিক্ষোভ-মিছিল। একের পর এক রক্তাক্ত ঘটনার ঘূর্ণাবর্তে সবাই নিক্ষিপ্ত। দেশের ভেতরে প্রতিবিপ্লব এবং বাইরে থেকে বিপ্লববিনাশী বৈদেশিক শক্তির হানাদারি। মাত্র দুই বা তিন বছরের মধ্যে বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব-যুদ্ধের অলাতচক্রে যেন গোটা জাতি ঘূর্ণ্যমান। অসামান্য সেই অভিজ্ঞতা। এবং পারীর শ্রমজীবী জনতা বা সাঁকুলোৎ-শ্রেণী সেই অভিজ্ঞতার শরিক। নিছক জীবিকার দাবিতে আন্দোলন থেকে বৃহত্তর রাজনৈতিক আঙিনায় তাদের উত্তরণ। এই তিনবৎসরব্যাপী রুদ্ধশ্বাস নাটকের তারাই যেন প্রকৃত কুশীলব।

লেফেভ্রের ভাষায়, পারীর গরিব মানুষ নিজেদের আশু সমস্যার প্রতিকার করতে গিয়ে আরো গভীর এবং সুদূরপ্রসারী ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এল। তারা সন্ধান পেল সাম্য ও স্বাধীনতার মর্মবাণীর। শুনতে পেল রুশোর সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের বাণী। তাদের রাজনীতির প্রথম পাঠ শুরু বিভিন্ন বৈপ্লবিক ক্লাব ও সমিতির সভাকক্ষে। তখন পারী শহর যেন ক্লাব ও বৈপ্লবিক সমিতির মৌচাক। ১৭৯৩ সাল নাগাদ তার সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো। সারা দেশে তাদের শাখা এবং সদস্যসংখ্যা পাঁচ লক্ষের কাছাকাছি। ঐতিহাসিক কোবান বলছেন: যখন পুরোনো শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, অথচ নতুন শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি—এ-সমস্ত বৈপ্লবিক সংস্থা সেই মধ্যবর্তীকালীন ক্ষমতাকেন্দ্রের অঙ্কুর। ওয়্যাকোবিন ক্লাব, হাল্লে ক্লাব ও স্বৈরাচারবিরোধী সমিতি প্রভৃতি সংস্থার সান্ধ্যবৈঠকে সাঁকুলোৎদের যোগ দিতে দেখা যেত। কালক্রমে সাঁকুলোৎদের বৃহত্তম অংশ জ্যাকোবিনদের কট্টর সমর্থকে পরিণত হয়। ১৭৯১ সালে যখন কর্দলিয়ে ক্লাব মাসিক দুই স্যু মাত্র চাঁদা ধার্য করল তখন ধনী-গরিব-নির্বিশেষে সকলেই ক্লাবের আলোচনা-সভায় অবাধে যোগ দিতে থাকে। তিন শ থেকে আট শ মানুষ প্রতি সন্ধ্যায় সেখানে জড়ো হত।

এদিকে তখন শ্রমজীবী মানুষের বোধগম্য ভাষায় লেখা অসংখ্য প্রচার-পুস্তিকা হাটেবাজারে লোকের হাতে-হাতে ঘুরছে। তা ছাড়া, হেবার্ট সম্পাদিত 'পেরদ্যুশেন' ও মারাটের "লামি দ্যু প্যপল্" এবং "জনগণের অভ্যুত্থান" প্রভৃতি সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র শ্রমজীবী মানুষের নিজস্ব মুখপত্রে পরিণত। তাদের অভাব অভিযোগ সমস্যা দুঃখ আর বেদনা ভাষা পেত মারাট আর হেবার্টের রচনার ছত্রে-ছত্রে।

ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠক প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার পাঠশালা। সংবাদপত্রে প্রকাশিত দেশাত্মবোধক রচনা পড়া হত সেখানে। তা ছাড়া, সংবিধান ও অধিকারের সনদ থেকে বিভিন্ন অংশ পাঠ করে শোনাত বাচ্চা ছেলেরা এবং তারপর শুরু হত সভার কাজ। আইনসভার কাজকর্ম, সদ্যঃপ্রবর্তিত বিভিন্ন আইন ও ঘোষণাবলীর খবর এভাবে পৌঁছে যেত এই নিরক্ষর গরিব মানুষদের কাছে। তারা গরিব, তারা নিরন্ন, তারা নিরক্ষর। তবুও তাদের উপর যেন ন্যস্ত এই ভুবনের ভার। তাদের উপর যেন বর্তেছে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। তারা হয়তো "কনট্রাক্ট সোস্যালে"র নামও শোনে নি, তবুও উপলব্ধি করতে পেরেছে সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের মর্মবস্তু। সাম্য আর স্বাধীনতার মর্মবাণী তাদের হৃদয়ে অচিরেই গাঁথা হয়ে যায়।

নিঃসন্দেহে তাদের দাবি হল সুলভ এবং সুপ্রচুর খাদ্য। সেই তাগিদ থেকে তারা একটার পর একটা বৈপ্লবিক অভিযানে শামিল। তারপর এল রূপান্তরের পালা। অস্তিত্বরক্ষার নিছক জৈবিক তাড়না থেকেই তারা সন্ধান পেল মহত্তর ভাবাদর্শ। গভীরতর হল জীবনবোধ—যার অভাবে হয়তো তাদের জীবিকার লড়াইও এতটা সংহত আর সংগঠিত হত না।

ছয়

তারপর বিপ্লবের ভেরী নিনাদিত—রাজপথে ব্যারিকেডের পর ব্যারিকেড—গির্জায়-গির্জায় ঘণ্টাধ্বনি—মাঝে-মাঝে গুলিগোলার শব্দ। শত্রু দুয়ারে দাঁড়িয়ে। ঠিক সে সময় রাজপ্রাসাদের অলিন্দে ষড়যন্ত্রীদের নিভৃত শলাপরামর্শ আর দেশজোড়া বিস্তৃত প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের জাল। বিপ্লববিরোধী পঞ্চমবাহিনীর তৎপরতা চলেছে রাত্রিদিন। দেশ আর জাতির জীবনে ঘোরতর সংকটমুহূর্তে—ইতিহাসের যুগসন্ধিতে তাদের ডাক পড়েছে। তারা আর সামান্য মানুষ নয়। তারা শুধু দিন-আনি-দিন-খাই মজুর নয়। তাদের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব আজ বিপ্লবের রাঙা আলোয় মহীয়ান। দেশ আর জাতির ভাগ্য তাদের উপর ন্যস্ত।

জীবনযাত্রা অসহনীয়। খাদ্যসামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া, যেহেতু মূল্যনিয়ন্ত্রণ নেই। রুটির দোকানের সামনে অপেক্ষমান মানুষের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। অনাহারে মৃতের সংখ্যাও কম নয়। ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকারও নেই। "অধিকারের সনদ" নিছক ভনিতা মাত্র। বিপ্লবের এই তো পরিণাম। অথচ সবদিক থেকে বঞ্চিত সেই মানুষদেরই ডাক পড়েছে

শত্রুর সঙ্গে গোপন আঁতাতে আবদ্ধ রাজা-ওমরাহ-পঞ্চম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যে বিপ্লবের কোনো প্রত্যক্ষ ফল যারা ভোগ করেনি সেই বিপ্লবকে রক্ষা করার আহ্বান এসেছে তাদের কাছে।

৯ অগস্ট ১৭৯২। ওই দিন রাত্রিতে পারীর প্রতিটি মহল্লা থেকে নির্বাচিত তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে মোট আটাশটি মহল্লার প্রতিনিধিদল পারীর পুরসভার প্রধান কার্যালয় ওতেল-দ্য-ভিলে গিয়ে উপস্থিত। তারা বর্তমান পুরকর্তাদের সরিয়ে দিয়ে বৈপ্লবিক কমিউন প্রতিষ্ঠিত করে। রাজা যেখানে বিশ্বাসভঙ্গকারী—তখন সন্দেহের ঊর্ধ্বে মানুষটি কে? আইনসভার কাজকর্মে মন্থর শৈথিল্যের ছাপ স্পষ্ট। সম্ভ্রম ও মর্যাদা হারিয়েছে আইনসভার সদস্যবৃন্দ। এক কথায়, পারীর সাধারণ মানুষ আস্থা হারিয়েছে প্রায় সকলের ওপর। অতএব তারা এই নতুন ক্ষমতা-কেন্দ্র বৈপ্লবিক কমিউনের দিকে তাকিয়ে। তারা চায় কমিউন সতর্ক থাকুক—প্রয়োজন পড়লে নির্মম হোক।

তারপরে শুরু কমিউনের নেতৃত্বে রাজা আর প্রতি-বিপ্লবী শক্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযান। এবং প্রতিটি সংঘাতের আঙিনায় শ্রমজীবী জনতা শামিল।

১৭ জুলাই (রোববার) ১৭৯১ : প্রথম সংঘাতের দিন। সেদিন সাঁজেমারেতে পঞ্চাশ হাজার নাগরিক কর্দলিয়ে ক্লাবের ডাকে সমবেত হয়। তারা এসেছিল রাজা ষোড়শ লুইয়ের পদত্যাগ-দাবিতে গণদরখাস্তে স্বাক্ষর করার জন্যে। অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হতে পারে নি। ছ হাজার লোক সবেমাত্র সই করেছে এবং তার মধ্যে রয়েছে অজস্র নিরক্ষর গরিব। তারা নাম-সইয়ের পরিবর্তে হয় বৃত্তচিহ্ন এঁকেছে বা শুধুমাত্র আঁচড় কেটেছে। এমন সময় দশ হাজার রক্ষী-বাহিনী নিয়ে লাফায়েত উপস্থিত এবং বিনা প্ররোচনায় গুলি বর্ষিত হয় সমবেত নিরস্ত্র মানুষের ওপর। ফলে পঞ্চাশজন নিহত ও অনেকে আহত। পারীর মানুষ এই হত্যা-কাণ্ডের জন্যে কোনোদিন ক্ষমা করে নি মেয়র বেলি ও লাফায়েতকে। বিশ্বাসভঙ্গকারী রাজার পদত্যাগ-দাবির অপরাধে তারা নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছে।

এই রক্তস্নান কিন্তু দমাতে পারে নি পারীর সাঁকুলোৎ-শ্রেণীকে। রাজতন্ত্র বনাম গণতন্ত্রের চূড়ান্ত সংগ্রামে তারা গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বস্ব উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। তখন পারীর দুয়ারে শত্রুর কামান-গর্জন। একটার পর একটা ঘাঁটি শত্রুকবলিত। ফরাসি সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী ব্যাপক অন্তর্ঘাত আর ওপরমহলের ষড়যন্ত্র। অতএব আবার বিক্ষোভের ঝড়। ২০ জুন ১৭৯২ : পারীর রাস্তায় কুড়ি হাজার মানুষের ক্রুদ্ধ মিছিল এবং তাদের লক্ষ্যস্থল তুইয়ারি রাজপ্রাসাদ। বিক্ষোভ-মিছিলে ফের তারা এসেছে যারা বছর কয়েক আগে বাস্তিল অভিযানে শামিল হয়েছিল। দোকানদার, কারিগর, ওস্তাদ ও তার সাকরেদ, ফুরন-শ্রমিক এবং খেটেখাওয়া মেয়েরা। সেদিন রক্ত ঝরে নি। রাজার চতুর বাক্যালাপে মুগ্ধ হয়ে তারা ফিরে যায়। রাজা স্বাস্থ্য পান করেছে জনতার উদ্দেশে—লালটুপি মাথায় দিয়ে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু রক্তপাত এড়ানো গেল না। রণাঙ্গন থেকে আরো বিপর্যয়ের সংবাদে উন্মত্ত জনতা এবার সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ-প্রাসাদের উপর। সেদিন ১০ই অগস্ট ১৭৯২। বাঁধ-ভাঙা জলস্রোত যেন ধেয়ে চলেছে। রাজার সুইশ দেহরক্ষীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়ছে একের পর এক সাঁকুলোতের নিষ্প্রাণ দেহ। অবশেষে জনতার হাতে কচুকাটা হয়ে গেল রাজার দেহরক্ষীরা, এবং রাজা আর রানী একবস্ত্রে আইনসভাকক্ষে আশ্রয় নিল। সেদিন যে তিন শ বিক্ষোভকারীকে শনাক্ত করা হয়েছে—দেখা যাচ্ছে তারা প্রায় পঞ্চাশ রকম পেশায় নিযুক্ত। দোকানি, খুদে ব্যবসায়ী, ওস্তাদ কারিগর, ফুরন-শ্রমিক, একজন শল্যচিকিৎসক, ন জন গৃহভৃত্য, দুজন সঙ্গীতশিল্পী, দুজন কেরানি আর কয়েকজন

বন্দর-শ্রমিক।

বাঘ যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ২ সেপটেম্বর আবার তাণ্ডবে মেতে উঠল পারীর মানুষ। এবার লক্ষ্যস্থল শহরের জেলখানা। বাইরে অপেক্ষমান শত্রু। প্রুশীয় সেনাপতি ডিউক অব ব্রান্সউইকের হুমকি: পারীর একখানা ইটও আস্ত থাকবে না। রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হবে ফরাসি বিপ্লব। সাধারণ মানুষের ধারণা—জেলখানায় আটক রাজভক্ত প্রতি-বিপ্লবী বন্দীরা সব ব্রান্সউইকের চর। একবার যখন শহর খালি করে স্বেচ্ছাবাহিনী ফ্রনটে চলে যাবে—তখনি এরা জেল ভেঙে বেরিয়ে আসবে। শুরু করবে তাণ্ডব—আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ রেহাই পাবে না। অতএব তার আগেই শেষ করে দাও। ঠেকানো গেল না গণরোষ। শহরের নটি কারাগারের প্রায় চোদ্দ শ বন্দীকে জনতা নির্মমভাবে হত্যা করল।

শিউরে ওঠার মতো ঘটনা, এবং সবাই স্তম্ভিত। সত্যিই কি অনিবার্য ছিল এই হত্যাকাণ্ড? আজো পর্যন্ত এই বিতর্ক অমীমাংসিত। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হত্যাকারীরা কেউ স্বভাবদুর্বৃত্ত নয় বা পেশাদার খুনে নয়। তাই নিহতদের কোনো জিনিসে এরা হাত দেয় নি। এরা সব সাধারণ মানুষ—দোকানদার, কারিগর, তালামিস্ত্রী বা মুচি। প্রতিদিন অহরহ ষড়যন্ত্রের গুজব ও ব্রান্সউইকের ভীতিপ্রদর্শন এদের হিংস্র আর অমানবিক করে তুলেছিল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা মাত্র তিন শ, অথচ পারীর সাধারণ মানুষ দৃশ্যটি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দেখেছে।

ঐতিহাসিক লেফেভ্রের মতে, জনতা সেদিন রক্তের নেশায় মেতেছিল। কিন্তু আত্মরক্ষার খাতিরে এই রক্তপাত। রাজা-অভিজাত-যাজকচক্রের একের পর এক ষড়যন্ত্র তাদের উন্মত্ত করে তোলে। এবং রক্তের দেনা রক্ত দিয়েই শুধতে হবে—এটাই সেদিন পারীর গরিব মানুষের মনের কথা।

বিপ্লবের রঙ এখন টকটকে লাল। কেন এত রক্তপাত! বিপ্লবীরা কি জল্লাদ! এ প্রসঙ্গে ভিক্টর হুগোর উক্তি স্মরণীয়: তিনি বললেন, একজন শল্যচিকিৎসকও দৃশ্যত কশাই। বিপ্লব আর নৃশংসতা অনেক সময় সমার্থক। বিপ্লব অঙ্গচ্ছেদ ঘটায় কিন্তু সেটা আরোগ্যের খাতিরে। তাই এই রক্তপাত। ২০ সেপটেমবর ভাল্মীর রণক্ষেত্রে ব্রান্সউইকের প্রুশীয় বাহিনী পরযুদস্ত হয়—তার কয়েক সপ্তাহ আগে এভাবে গৃহশত্রু নিরমূল হয় জনতার হাতে।

সাত

রক্তের নদীতে নিমজ্জিত ফরাসি রাজতন্ত্র। সাঁকুলোৎ-শ্রেণীর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পারী কমিউনের সমর্থনপুষ্ট জ্যাকোবিন দল এখন ক্ষমতায় আসীন। সমকালীন ফ্রান্সের প্রভাবশালী দুটি দল গিরোনডিস্ট ও জ্যাকোবিনের মধ্যে সাঁকুলোৎ শ্রেণীর সমর্থন জ্যাকো-বিনদের দিকে। বিপ্লবের গণভিত্তি সম্প্রসারণ ও গণ-উন্মাদনা সৃষ্টির তালে-তালে জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর প্রাধান্য ক্রমবর্ধমান। ঐতিহাসিক কোবানের মতে, জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর অবস্থান ধনী ও নির্ধন—উভয়ের মাঝামাঝি। নানা ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা উভয়েরই বিরোধী। শ্রেণীস্বার্থের চেয়ে আদর্শই এই গোষ্ঠীর সংহতির বনিয়াদ। নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এই জ্যাকোবিন দল।

১৭৯২ সালে প্রুশীয় বাহিনী যখন পারীর দুয়ারে, জ্যাকোবিন নেতা দান্তন তখন শহরবাসীর প্রতিরোধের প্রতীক। সাহস—সাহস—আরো সাহস—তাঁর এই দুর্জয় মন্ত্র সেদিন উদ্দীপিত করেছিল সমস্ত হতোদ্যম মানুষকে।

বিপ্লবের সন্ধিক্ষণে যখন একের পর এক জননেতা চরম দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে—তখন জ্যাকোবিন নেতা রোবস্পীয়েরের ভাবমূর্তি পারীবাসীর চোখে ক্রমশ উজ্জ্বলতর। তিনি একা ধারাবাহিকভাবে গণতন্ত্রের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।

জ্যাকোবিন দলের অন্যতম স্তম্ভ মারাটের সংবাদ-পত্র "জনগণের বন্ধু" প্রকৃতপক্ষে ছুঃস্থ জনতার বন্ধু। যখনই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাল—তখনই মারাটের কলম ঝলসে ওঠে: মুনাফাখোরদের তাদের দোকানের সামনে ফাঁসিতে লটকানো উচিত।

অতএব জ্যাকোবিন দল পারীর শ্রমজীবী মানুষের হৃদয় সহজেই জয় করে। এ বিষয়ে জ্যাকোবিন নেতাদের আগ্রহও কম নয়। যেমন রোবস্পীয়েরের অন্তরঙ্গ সহযোগী জর্জ কুথোঁ (Couthon) মনে করেন: জনসাধারণ যদি মনে করে যে বিপ্লবে তার স্বার্থ রয়েছে—তবেই বিপ্লব রক্ষা করা সম্ভব।

৩ জুন ১৭৯৩—জ্যাকোবিন দলের কাছে একটা ছক রাখেন মারাট এবং সে সূত্রে তাঁর মন্তব্য: ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে বিপ্লবের সপক্ষে সাধারণ মানুষকে টেনে আনতে হবে। আমরা কারো সম্পত্তিতে হাত দিতে চাই না। কিন্তু মানুষের জীবনের চেয়ে পবিত্র সম্পত্তি আর কী হতে পারে? আমরা সেই সম্পত্তি রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সেই অঙ্গীকার পুরোপুরি পালিত হয় নি। ১৭৯৩ সালের গোড়ায় নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী। ১৭৯০ সালের তুলনায় কফি, চিনি, মোমবাতি আর সাবান-সহ যাবতীয় পণ্যের দাম দ্বিগুণ। ফলে প্রবল গণবিক্ষোভ এবং আবার নীচুতলার মানুষদের সঙ্গে জ্যাকোবিন দলের সমর্থক সহ গোটা বিত্তবান শ্রেণীর মুখোমুখি সংঘাত বাঁধে। পরিশেষে গণ-আন্দোলনের চাপের ফলে আইনসভা (ন্যাশনাল কনভেনশন) ২৯ সেপটেম্বর জিনিসপত্রের দাম বেঁধে দিতে বাধ্য হয়। পাশ হয় 'ম্যাক্সিমাম জেনারেল' আইন। উনচল্লিশটা জিনিস এই আইনের আওতায় আসে। মজুরির সীমাও তারই সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। জুন ১৭৯০-এর তুলনায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মজুরিবৃদ্ধি অনুমোদিত হয়।

অল্পকালের জন্যে হলেও পরিস্থিতি খেটেখাওয়া মানুষের পক্ষে স্বস্তিদায়ক। তখন শাসনব্যবস্থায় সহযোগী ভূমিকায় দেখা যায় সাঁকুলোৎ-শ্রেণীকে। জ্যাকোবিন দল ও সাঁকুলোৎ মৈত্রী বিপ্লবের ভিত্তিকে মজবুত করে। কিন্তু তারপর পশ্চাদ্‌বর্তনের পালা। জ্যাকোবিন-অনুসৃত সন্ত্রাসনীতির পেছনে গোড়ার দিকে জনসমর্থন ছিল। ধরে নেওয়া হত জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্যে সন্ত্রাসনীতি অপরিহার্য। মানুষের বিশ্বাস বিপ্লবী ট্রাইবুনাল কখনো নির্দোষ মানুষকে সাজা দিতে পারে না। কিন্তু বিপ্লব যে নিজের সন্তানেরই খাদক। অতএব সন্ত্রাসের খড়্গ নেমে এল খোদ জ্যাকোবিন গোষ্ঠীর নেতাদের ওপর। মধ্যপন্থী রোপস্পীয়ের বিপ্লবের আতিশয্য যেমন প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক—তেমনি অনাগ্রহী সন্ত্রাসনীতির এতটুকু শৈথিল্যে।

হেবার্টপন্থী এবং দান্তন আর তাঁর অনুগামীদের বিচারের বিবরণ অত্যন্ত হৃতবুদ্ধিকর। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—রোবস্পীয়ের আর তাঁর অনুগামীদের কি বোধশক্তি লুপ্ত হয়ে ছিল? ছুটো বিকল্প তখন তাঁদের সামনে। হয় হেবার্ট-প্রদর্শিত সমাজবিপ্লবের পথ, অথবা দান্তনের নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পথ, তার মধ্যে কোনোটাই তাঁরা নিলেন না। অতএব অচল অবস্থা এবং ঘনিয়ে আসে রোবস্পীয়েরের পতনের দিন।

আট

১৭৯৪ সালের গোড়ায় আবার শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল বিক্ষোভ। এত উত্তেজনা ও সংগ্রামী চেতনা বিপ্লবের কোনো পর্বে দেখা যায় নি। ধর্মঘট আর মিছিলের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। এবং অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে অস্ত্র কারখানার শ্রমিক। কারখানায়-কারখানায় অবস্থান ধর্মঘট এবং শ্রমিক নেতাদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করা হতে থাকে। এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় যারা ভালো মজুরির আশায় চলে গিয়েছিল—তারাও রেহাই পায় না। তাদেরও

গ্রেপ্তার করা হয়। এই শ্রমিকদলননীতি সাঁকুলোৎ-শ্রেণীর কাছে অকল্পনীয়। এবং এবার জ্যাকোবিন নেতাদের সম্পর্কে স্বপ্নভঙ্গের পালা।

এদিকে ১৭৯৩ সাল নাগাদ মঞ্চে আবির্ভূত এক-দম নতুন ধরনের নেতা। নিছক রাজনৈতিক সংস্কারে তাঁরা আস্থাশীল নন—মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতিকারই তাঁদের প্রধান চিন্তা। আঁরাজে বলে পরিচিত এই গোষ্ঠীর মুখপাত্র 'লাল পাদরি' জ্যাক্ রু।

জ্যাক রু-র চিন্তাধারা আসলে শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি। একটি আবেদনপত্রে (২৩ জুন '৯৩) জ্যাক্ রু লেখেন: স্বাধীনতা অলীক বস্তু যখন একদল অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। যখন বিত্তবানরা স্বদেশবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—তখন স্বাধীনতা অর্থহীন নয় কি?

তাঁর মতে, সাম্য-ও তো অর্থহীন যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত না হয়। গরিবের চেয়ে ধনী কেন বেশি আরামে থাকবে? তাদের যাবতীয় উদ্‌বৃত্ত দরিদ্রের সেবায় বিলিয়ে দিতে হবে। অতএব তাদের বাড়তি যা কিছু আছে সব কেড়ে নাও—কারণ উদ্‌বৃত্ত থাকার অর্থ জনগণের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ।

জ্যাক্ রু-র ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা: শয়তানদের সম্পত্তির দাম কি মানুষের চেয়েও বেশি দামি?

জ্যাক্ রু শ্রমজীবী মানুষের সামনে নিশ্ছিদ্র সাম্যের এক কল্পলোক তুলে ধরেন। ১৭৯৪ সালে পুলিশের চর প্রোভোস্তের রিপোর্ট: জ্যাকোবিন বলে পরিচিতা এক নারী তার বান্ধবীকে বলেছিল—তোমার তো ছুটি ড্রেসিগাউন আছে—তার একটা আমায় দাও। এভাবে আমরা বাকি জিনিসগুলিও ভাগবাঁটোয়ারা করে নেব।

পারীর কনট্র্যাক্ট সোশ্যাল মহল্লার নাগরিকদের সভায় জনৈক বক্তা বলেন: বড়ো লোকদের খেসারত দেবার সময় এসেছে এখন। যার ছুটো থালা রয়েছে—তার একটা অন্যকে দিতে হবে। সবাই হর্ষধ্বনি-সহকারে এই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়।

১০ অগস্ট ১৭৯৩, মারাটের সংবাদপত্রের লেকলের লেখেন: ছুঃস্থ লোকদের বিনামূল্যে খাদ্য দিতে হবে। ধনীদের বিলাসব্যসন বন্ধ রেখে গরিবদের বাঁচাতে হবে।

অতএব মধ্যবিত্ত-প্রধান জ্যাকোবিন দলের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সহাবস্থানের মেয়াদ ফুরিয়ে এল। উভয়ের সামাজিক বৈষম্য আর চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। সাঁকুলোৎ-শ্রেণী মূলত খুদে উৎপাদক আর কারিগরদের শ্রেণী। তাদের আশঙ্কা যে বড়ো উৎপাদক আর বড়ো মালিকের সঙ্গে অসম প্রতি-যোগিতায় তারা নিঃস্ব সর্বহারায় পরিণত হবে। তাই তারা বড়ো মহাজন ও শিল্পপতিদের নিপাত চায়। তাদের মতে, ব্যাঙ্ক ও শেয়ার মার্কেট সমস্ত নষ্টের মূল। তাদের দাবি—কনভেনশন সমস্ত ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করুক। কারণ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, ম্যানেজার প্রমুখ বড়োলোকরাই প্রজাতন্ত্রের অগ্রগতির সামনে প্রধান বাধা।

সাঁকুলোৎ-শ্রেণীর উপলব্ধি: তাদের কল্পলোক-আশ্রয়ী সাম্যের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হল বণিক-পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত বিকাশ। অতএব অনিবার্য সংঘাত। একদিকে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সযত্নলালিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, অপরদিকে ইতিহাসের অঘোষ পরিণাম—যার পরিণতি সাঁকুলোৎ-শ্রেণীর সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের বিনষ্টি আর বুর্জোয়াশ্রেণীর জয়।

রুশোর সর্বজনীন সার্বভৌমত্বের মতাদর্শে লালিত সাঁকুলোৎ-শ্রেণী কিন্তু প্রজাতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী। সজাগ থাকা চাই যাবতীয় চক্রান্তের বিরুদ্ধে—'সতর্ক চক্ষু' তাই বিপ্লবের প্রতীক। শ্রমজীবী মানুষের মিছিলে-মিছিলে দেখা যেত পতাকার বুকে রয়েছে একটি ত্রিভুজ এবং ত্রিভুজের মধ্যে আঁকা চোখ—সতর্কতার প্রতীক।

নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনে তারা বিশ্বাসী এবং তাদের মতে আন্দোলনই মুক্ত স্বাধীন মানুষের একমাত্র হাতিয়ার। ২৭ ডিসেমবর, ১৭৯২, থিয়েটার ফ্রাঁসোয়া

শাখার সভায় সাঁকুলোৎরা ঘোষণা করল : আমরা আন্দোলনে রত। যতদিন না ফ্রান্স শত্রুমুক্ত হচ্ছে ততদিন এই আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ ছাড়া আর কোনো ভাষা তাদের জানা নেই।

•

অবশেষে ২৭ জুলাই ১৭৯৪ (৯ থার্মিডর)—বক্তৃতার মাঝখানে রোবস্পীয়েরের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দিল ন্যাশনাল কনভেনশনের সদস্যরা। রোবস্পীয়ের আর তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ সহযোগী সঁজুস্ত ও জর্জকুথোঁ-কে গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়। তারা স্বৈরাচারী, এখন সবই নির্ভর করছে পারীর শ্রমজীবী জনতার ওপর। যারা ১৭৯২ সালে নির্মূল করেছে রাজতন্ত্র—যারা ১৭৯৩ সালে গিরোণ্ডীদলকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে তারাই একমাত্র পারে রোবস্পীয়েরকে বাঁচাতে। না—তারা তা করল না।

এদিকে তখন বিপদের ঘণ্টা ধ্বনিত—ভেরী নিনাদিত এবং তিন হাজারের মতো লোকও জড়ো হয়েছে। যেই শুনল রোবস্পায়ের আইনের চোখে আসামি এবং গ্রেপ্তার এড়িয়ে বেড়াচ্ছে—তখন তারাও চলে গেল। রোবস্পীয়েরের অপরাধের যেন শেষ নেই। রোবস্পায়ের পুরসভার স্বাধীনতা হরণ করেছেন—হত্যা করেছেন জ্যাক্ রু আর শোমেৎ-কে। শত-শত নিরপরাধ মানুষকে গিলোটিনে পাঠিয়েছেন। মজুরি-বৃদ্ধি ঘটতে দেন নি এবং সর্বোপরি শ্রমিক-ধর্মঘট ভেঙেছেন। অতএব পারীর মানুষ রোবস্পীয়েরের ভাগ্য তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে গেল।

দান্তন ও হেবার্টের রক্ত প্রতিশোধ চাইছে এবং রোবস্পীয়েরের প্রাণনাশের সঙ্গে-সঙ্গে রচিত হল বিপ্লবের সমাধি। মজুরির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়াতে বিক্ষুব্ধ পারীর শ্রমিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দেখল রোবস্পীয়েরের মৃত্যু। হয়তো ভেবেছিল এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যা ঘটল সেটা তারা চায় নি। প্রতিক্রিয়ার খড়্গ নেমে এল থার্মিডর প্রতি-বিপ্লবের আকারে। প্রতিষ্ঠিত হল নিরঙ্কুশ বুর্জোয়া শাসন—আরো আঁটসাঁটো ভাবে।

কিন্তু সে দিনগুলির কথা কি ভোলা যায়? যখন জননিরাপত্তা কমিটি যুদ্ধকালীন অর্থনীতি চালু করে ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে? তখন যে তারা অল্পদিনের জন্য হলেও সুখের মুখ দেখেছিল। পারীর গরিব মানুষ অচিরেই অনুভব করল বিপ্লবের কবর খোঁড়া হয়েছে এবং তাদের প্রত্যাশার দিন শেষ। আসলে তারা যে সোনার হরিণ ধরতে চেয়েছিল। সাম্যের ব্যাকুলতা নিয়ে সাঁকুলোৎ শ্রেণী একদা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। বৈপ্লবিক উদ্দীপনা নিয়ে তারা প্রথমে নেমেছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং পরে বুর্জোয়াদেরই একাংশ তাদের ব্যবহার করেছে সামন্ত-তন্ত্রকে উৎখাত করার অভিযানে। কিন্তু কল্পাশ্রয়ী সাম্যের ধারণায় সেদিন তারা উদ্বেলিত এবং এবিষয়ে তারা সপ্তদশ-শতকীয় ইংল্যানডের লেভেলার গোষ্ঠীর সমগোত্রীয় এবং বিংশ শতকের কমিউনিস্টদের পূর্বসূরী।

সূত্রনির্দেশ

1. Albert Soboul—The Parisian Sans-culottes and the French Revolution (1793-4)
2. Alfred Cobban—A History of Modern France. Volume 1 : 1715—1799
3. Archibald Robertson—The French Revolution
4. George Rude—The Crowd in the French Revolution
5. Georges Lefebvre—The Coming of the French Revolution—1789
6. M. N. Roy—Reason, Romanticism and Revolution (Volume 1)
7. Ten Essays on the French Revolution (The Bookman, 1946)
8. Victor Hugo—Ninety Three
9. সরোজ আচার্য—রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)

নেশা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

আদিম জঙ্গলে যাই থিকথিকে কালো অন্ধকারে
অশিক্ষিত গ্রামের প্রধান তার ডালপালা মেলে—
পাখিরও প্রবেশ নেই শ্বাপদের দিব্য চলাফেরা
সরীসৃপ ঝুলে থাকে অন্ধকার খাদ্য ও পানীয়…

শৌখিন ভ্রমণকারী বন্দুক লাঠি ও টর্চ হাতে
দুদিন এসেছে গ্রামে কার্বলিক অ্যাসিড সমেত
ফার্স্ট এড বাক্স আছে, সঙ্গে আরও বোতল-বোতল
মিনারেল জল, আহা, সে এসেছে উজ্জ্বল উদ্ধারে…

সতীমন্দিরের থানে প্রণাম করবে না ভেবেছিল
চক্ষুহীন মানুষের মাথা কোটা তাকেও তখন
আনত করেছে। বৈজ্ঞানিক অভিমান ধুলোবালি
অন্ধকার খায়; রোমানটিক সর্বনাশে ক্লান্তি নেই

নির্ভরতা বুকের ভেতরে ক্রমে নীল স্বপ্ন বোনে
ঘুম শুধু ঘুম চাই নেশাতুর আদিম জঙ্গলে…

অতর্কিত পদ্য

গৌতম হাজরা

১. নীল প্রান্তরে আজো জমে আছে কিছু কালো মেঘ।
কে ডাক আমার ডাকনামে?
শিলার সংঘাতে আজ ক্ষয়ে যায় সব
জল মিশে যায় ঐ আকাশনীলে
দেখি দোমড়ানো জীবনের শ্বাস পড়ে আছে
নির্বান্ধব ঘরে!

দূরে কেঁপে উঠছে পাতা
বাতাসে নিমফুলের গন্ধ
অরণ্য আঁধার আমায় ডেকো না
ডেকো না···ডেকো না···ডেকো না···
এখন গুনছি ভুলের মাশুল!

২. বাতাসে ওড়াও যদি ভালোবাসার শব্দ
আমি জলের অতলে বাজব নূপুরের মতো
তুমি শুধু আমাকে জতুগৃহ থেকে মুক্ত করে নিয়ো!

৩. হাসতে-হাসতে আমি ভেঙে ফেলতে পারি শব্দের মিনার
যদি বল, আঁধারের ভেতর ঐ কার অট্টহাসি
পাপী কারা, কেন স্পর্ধা, রক্ত কেন হিম হয়ে আসে?

কোয়েলিন ফল

বিপ্লব মাজী

গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে ছিলাম,

আমি জানতাম না
আঘাত তোমার বুক ভ্যান-গথের চষা খেত করে চলে গেছে
তুমি ভেঙে পড়েছ ঝড়ে-কেঁপে-ওঠা জাহাজের মতো

অজানা সেইসব মুহূর্তে বীজ খুঁজে-খুঁজে
আমি ফিরছিলাম সূর্যের রোদে রাঙা
আমার ভাঙা বাড়ির দিকে

দীর্ঘ গ্রীষ্মের যন্ত্রণায় পাগল আমি,
আমার মনে হচ্ছিল আমি বাস করছি স্মরণীয় কোনো নাটকের একটি দৃশ্যে
যেখানে লতাগুল্ম জড়ানো, স্যাঁতস্যাঁতে, কোনো আদিম গুহার ভেতর দাউদাউ আগুন জ্বলছে

তোমার নরম পাঁচ আঙুলের ছাপ
এখনো যখন বুকের মধ্যে স্মৃতির ছায়ার মতো বেড়ে ওঠে
নতচোখে তাকিয়ে থাকি আত্মার গভীরে

কত অন্তরীপ পেরিয়ে যাই, শেষে পৌঁছে যাই এক জনমানবহীন দ্বীপে

সমুদ্রের ঢেউয়ে দাঁড়ের শব্দের মতো তুমি হারিয়ে গেছ,
দৃষ্টির সীমায় ঝিনুকের ছায়ার মতো জেগে ওঠে না তোমার ত্বক,
আমার অপরাধ গত সন্ধ্যার বৃষ্টির ভেতর

সেই প্রথম তোমার ঠোঁটে ঠোঁট গেঁথেছিলাম,
পেয়েছিলাম আগুনের মতো নির্ভার রসে ভরা
কোয়েলিন ফলের স্বাদ

সেই মুহূর্তে পৃথিবী মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল,
বুকের মধ্যে টপ টপ টপ বৃষ্টি পড়ার শব্দ:
ওরা তোমাকে আমার কাছে আসতে দেয় না

ওরা এখন খুনীদের চেয়েও নিষ্ঠুর···
চিন্তাগুলো বিষণ্ণ, ভেঙে গেছে
পাথরের টুকরোর মতো এখানে ওখানে ছড়ানো,
ক্রমশ স্মৃতির ভেতর লুপ্ত হচ্ছে তোমার স্মৃতি···

ঘরে বাইরে

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

এই তো বনভূমি ভীষণ নির্জন
আদিম ঘরব্যাপী ছায়াটি পড়ে আছে
ভিতরে, উপকূলে মাছের মতো মন
বাইরে আলোহীন শিকার, আলোচনা।

পুরোনো চাকা ফিরে এসেছে মাঝখানে
সবুজ, পাকা ফল বিশদ ঝরে পড়ে
ফেনিল হয়ে ওঠে ধ্যানে ও ব্যবধানে
স্বপ্ন আমাদের ফুলের বিপরীতে।

আগুন, ফুলমালা ছিঁড়েছি অবিরত
হয়তো বনভূমি হঠাৎ পুড়ে যায়
শব্দ বাড়ে, কমে মাছের জলাশয়ে
ধাতব রক্তিম একটি পরিখায়।

আমরা জানি তাকে গণিতহীনা ব'লে
নগ্ন দেহ নিয়ে সে আনে উদ্ভিদ
এবং উপকূলে এখনো আলো জ্বলে
প্রেমেও মনে হয় বিষাদ জমে আছে।

বনের মতো ঘরে হঠাৎ ঐ তার
অপর সঙ্গীটি কখন চলে এলো!
আমার মূল ছুঁয়ে—ওদের ব্যবহার
দেখেছি রাতভর, মাছের মতো ডুবে···

আবুল কালাম আজাদের চিন্তাধারা, মুসলমান সমাজ ও স্বদেশ

পুলকনারায়ণ ধর

মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে আমরা তেমন করে কখনই পাই নি, যেমন করে পেয়েছি জওহরলাল নেহরুকে, সুভাষচন্দ্র বসু বা গান্ধীজীকে। এঁদের সম্বন্ধে এবং এঁদের চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে আমরা যতটা ওয়াকিবহাল, আজাদ সম্বন্ধে যেন আমরা ততটাই উদাসীন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হয়েও আজাদ যেন ছিলেন কোন্ দূর নক্ষত্রের মানুষ। সমস্ত রকম প্রচারের প্রতিযোগিতা থেকে তিনি বরাবরই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ আর শিক্ষার অহঙ্কার তাঁকে "জনগণের নেতা" হতে সাহায্য করে নি।

তাঁর জন্মশতবর্ষে এবং মৃত্যুর তিরিশ বৎসর পরে তাই আজাদ আমাদের স্মৃতিতে তেমন অম্লান নন। তাঁর রচিত বিখ্যাত "ইনডিয়া উইন্‌স্ ফ্রীডম" গ্রন্থের এতদিন পর্যন্ত অপ্রকাশিত তিরিশ পৃষ্ঠার জন্য অধুনা তিনি কিছুটা বিতর্কের পাদপ্রদীপে এলেও তাঁর চিন্তাভাবনার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নে আমরা তেমন যত্নবান হতে পারি নি।

আমাদের দেশে না হলেও বিদেশে অবশ্য আজাদকে নিয়ে বিশ্লেষণ হয়েছে। আয়ন হেনডারসন ডগলাস নামে একজন বিদেশী পণ্ডিতের গবেষণার বিষয় হল আবুল কালাম আজাদ। সম্প্রতি তাঁর গবেষণার ফল আমাদের হাতে পুস্তকাকারে এসে পৌঁছেছে। পুস্তকটির নাম "আবুল কালাম আজাদ —অ্যান ইনটেলেকচুয়াল অ্যানড রিলিজিয়স বায়োগ্রাফি"। আবুল কালাম আজাদের বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় জীবনী।

লক্ষ করার বিষয়, লেখক আজাদের নামের আগে "মৌলানা" শব্দটি ব্যবহার করেন নি। গ্রন্থটির সর্বত্র তিনি "মৌলানা" কথাটি আবুল কালাম আজাদের নামের ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন। "মৌলানা" নাম বর্জনের মধ্য দিয়েই লেখক আবুল কালাম আজাদের ধার্মিক মনন অনুসন্ধান করেছেন। প্রচলিত অর্থে

"মৌলানা"র পরিচয় আবুল কালাম আজাদের জীবনে কোথাও ছিল না। আবুল কালামের চিন্তার জগৎকে বুঝতে না পারলে তাঁর রাজনীতি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আমাদের জ্ঞানগোচর হবে না।

মৌলানা আজাদ একজন তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী মুসলমান" বা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে যে ভূমিকা পালন করেছেন, তার পশ্চাৎপটে আছে এক দীর্ঘ পথপরিক্রমার ইতিহাস—চিন্তা এবং শিক্ষার দীর্ঘ কঠিন বিবর্তনের ইতিহাস।

মৌলবাদী ধর্মীয় শিক্ষার তরুচ্ছায়ায় যিনি জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ালেন আধুনিক মননশীলতার আর মুক্ত বুদ্ধির অঙ্গনে; সেখানে একই সঙ্গে তিনি একজন ভারতীয় এবং মুসলমান; ট্র্যাডিশন আর আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়। প্রাচীন পন্থার আর ধর্মীয় গোঁড়ামির তিনি ছিলেন বিরুদ্ধ শক্তি। জে. বি. কৃপালনীর ভাষায়, 'His was essentially a voice of reason, which would also mean moderation and sanity'। যে যুক্তিবাদের পথ ধরে তিনি গোঁড়া ইসলামি শিক্ষার শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই যুক্তিবাদ ছিল তাঁর জীবনসঙ্গী। ধর্ম সেখানে নির্বাসিত নয়। গান্ধীজীর মতন ধর্ম সেখানে "মানুষের ধর্মে"র রূপ নিয়েই এসেছে। সহিষ্ণুতার পললে সমৃদ্ধ "ধর্ম" সেখানে "ধর্মনিরপেক্ষ"। ধর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে আর ধর্মচিন্তার জগতে তিনি "মৌলানা" নন। সেখানে তিনি স্বাধীন স্বতন্ত্র—আজাদ।

যে পরিবারে, যে সমাজে আর সময়ে তাঁর জন্ম, সেই পরিবার আর সমাজের জন্মচিহ্ন আজাদ অস্বীকার করতে পারেন নি। বরং বলা যায়, নানা জায়গায় আজাদ তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর তিনটি আত্মজীবনীতে আমরা তার সন্ধান পাই। আজাদ পুরনোকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়েই তাঁর ঘর ছেড়েছেন। সময়, সমাজ আর পরিবার তাঁকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে যে দ্বন্দ্ব আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা মুসলমান সমাজকে অস্থির করে তুলেছিল, সেই অস্থিরতা থেকে জন্ম নিল ধর্মসংস্কারের নানা আন্দোলন। কোনো ধার্মিক মুসলমান তার বাইরে থাকতে পারেন নি। আজাদের গোঁড়া ধর্মনিষ্ঠ পিতা খেয়ারুদ্দিনও তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। এমনকী বালক-পুত্র মহিউদ্দিনও (আজাদ) এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। যুগের জটিলতা, স্ববিরোধিতা আর দ্বন্দ্ব আজাদকে জীবনব্যাপী বহন করতে হয়েছে। ইসলামের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দার্শনিক জিজ্ঞাসা ভারতে যে পটভূমি রচনা করেছিল, আজাদ তারই সঙ্গে যুক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর মুসলিম রাজনীতি আজাদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার কাঠামো নির্মাণ করেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতে সর্বত্র অশান্তি এবং অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল। ইসলামের মূল নীতি আর মূল্যবোধের অবলুপ্তি ঘটেছিল। এই সময়ে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) মুসলমান সমাজের অনৈক্য, ভ্রষ্টাচার দূর করার প্রয়াসে পবিত্র কোরআনের মূল বাণীর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চিন্তাভাবনাকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করাবার জন্য তিনি ইসলামের তক্‌লিদের(Taqlid) বিরোধিতা করেন। মুসলমান সমাজে এই ধরনের কাজ উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজে "বেদান্তে"র বিরোধিতার শামিল। কোরআনের মূল বাণীকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করার প্রয়াসে তিনি প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান যাজক মার্টিন লুথারের মতন একটি বিরাট কাজ করেছিলেন। তিনি পারসি ভাষায় কোরআনের অনুবাদ করেছিলেন। পরে তাঁর পুত্র আবদুল কাদির (১৭৫৩-১৮২৭) উর্দু ভাষায় কোরআন অনুবাদ করেন। শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে

মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে শাহ ওয়ালিউল্লাহ নতুন সংস্কার-আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষরা অনেকেই ওয়ালিউল্লাহর শিষ্যবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজাদের পিতা সুফী পীর খেয়ারুদ্দিন এই নতুন চিন্তাভাবনা থেকে ছিলেন অনেক দূরের মানুষ। তিনি ওয়ালিউল্লাহর উত্তরসূরী এবং "ওয়াহাবি" আন্দোলনের আবহাওয়া থেকে পুত্রদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।

ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাধারা অনুসরণ করে পরবর্তী কালে সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১) গড়ে তোলেন "মুজাহিদিন" আন্দোলন। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুফী-বিরোধী ইসলামি চিন্তানায়ক আবদুল ওয়াহবের সঙ্গেও সৈয়দ আহমেদের আন্দোলনের ভাবধারার সাযুজ্য ছিল। ওয়ালিউল্লাহর প্রভাব পড়েছিল স্যর সৈয়দ আহমদ খান নামক আরেকজন সংস্কারবাদী, পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক ব্যক্তির উপরও। সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে, এবং নতুন যুগকে মেনে নেবার জন্য এক আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। "আলিগড় আন্দোলনে"র ক্ষেত্রে একটি প্রমুখ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজেকে "ওয়াহবি" বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইসলামের কথা কোরআনের মূলবাণীকে উলেমাদের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার জাল থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনে তিনি আন্দোলন করেন। স্যার সৈয়দ ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অভিমানী মুসলমান সম্প্রদায়কে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। আহমদ খান চেষ্টা করেছিলেন ইসলামের মূল দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত রেখেই একটি আধুনিক যুক্তিবাদী ধারা সৃষ্টি করতে। এজন্য তাঁকে কট্টর ইসলামপন্থীদের কঠোর বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা এগিয়ে গেছে। মুসলমানরা অনেক পিছনে পড়ে ছিল তাদের হৃত রাজগৌরবের স্মৃতি নিয়ে। তাই স্যর সৈয়দ আহমদ মুসলমান সমাজকে আধুনিক করার প্রয়াসে রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মুসলমান সমাজে তাঁর এই ভূমিকাকে কোনো অংশেই হিন্দু সমাজের রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা থেকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে যখন ইংরেজদের যত্নে আর আনুকূল্যে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল, তখন "আলিগড় আন্দোলনে"র পাশাপাশি ইসলামি পণ্ডিতরা ক্ষুদ্র মাদ্রাসার গণ্ডিকে আরও ব্যাপক করে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। মৌলানা মহম্মদ কোয়াসিম ওরসিদ আহমদ গাঙ্গোহির নেতৃত্বে সাহারানপুরের "দেওবন্দ" মাদ্রাসা (১৮৬৭) প্রতিষ্ঠা এই চেষ্টারই একটি সার্থক ফল।

সামন্ততন্ত্র আর নতুন ধনতন্ত্রের যে দ্বন্দ্ব তখন ভারতীয় সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, ভারতীয় মুসলমান সমাজের ধর্মচিন্তার মধ্যেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছিল। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ইসলামের শুদ্ধিকরণ হবে, না, ধনতান্ত্রিক পরিবেশে ইসলামকে যুগোপযোগী করে তোলা হবে—এটাই ছিল তখনকার ইসলামি ধর্ম আন্দোলনের মূল দ্বন্দ্ব।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় হতাশ হয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসনের কবল থেকে ইসলামকে উদ্ধার করার স্বপ্ন চিরতরে তিরোহিত হল। মুসলমান উলেমারা তখন ইসলামকে রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরোধিতা করার নতুন-নতুন পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা শুরু করেন। ইসলামের ভিতকে আরও শক্ত করার প্রয়াসে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম-শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাঁরা নতুন বৌদ্ধিক সংগ্রাম শুরু করেন।

"দেওবন্দ" আর "আলিগড়" ভিন্ন ধারায় গঠিত হলেও এই উভয় প্রস্থানের লক্ষ্য ছিল এক। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজের নবজাগরণ। উনবিংশ

শতাব্দীতে যেমন খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ আর গোঁড়া হিন্দুসমাজ একযোগে আন্দোলন করেছিল, দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছিল, সেইরকম দেওবন্দ আর আলিগড়ের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার করা, খ্রীষ্টানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। হিন্দুদের অপেক্ষা ইংরেজ আর খ্রীষ্টানদের প্রতি মুসলমান সমাজের ঘৃণা আর বৈরিতা অনেক বেশি তীব্র ছিল। তার কারণ, এই ঘৃণা আর বৈরিতা ছিল পারস্পরিক, যা লালিত হয়ে আসছে প্রাচীন ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় থেকে। তবুও যুগের প্রয়োজনে উভয় প্রস্থানই অনেক ক্ষেত্রে নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সৈয়দ আহমদ খান "কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। দেওবন্দিরা অবশ্য তাঁর মতন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন নি। বরং ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সঙ্গে হাত মেলাবার ফতোয়া দিয়েছিলেন। আলিগড় আন্দোলকদের কাছে কংগ্রেস ছিল একটি বিপজ্জনক, অনভিপ্রেত পদক্ষেপ। আসলে রাজনীতি, না, ধর্ম-নীতি—কোন্ পথ অনুসরণ করলে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি ঘটবে, তাদের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার করা যাবে—তা নিয়ে মুসলিম সমাজেই ছিল নানা সংশয় আর দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলমান নেতারা একটি সুনির্দিষ্ট পথের অনুসন্ধান করে যাচ্ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে সৈয়দ জামালউদ্দিন আফগানীর (১৮৩৯-১৮৯৭) নেতৃত্বে "প্যান্-ইস্‌লাম" আন্দোলনের সূচীমুখ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে; কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়। তিনি মুসলমান আর অমুসলমানদের মিলনের প্রয়োজনের উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি বুঝেছিলেন যে শক্তিশালী ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে অমুসলমানদের সহযোগিতা-লাভে ইংরেজদের বঞ্চিত করা দরকার। এ ছাড়াও, "ওয়াহাবি" আর বাঙলার কৃষকদের মধ্যে "ফরাজি" আন্দোলনও মুসলমান-সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পানজাবের "আহমদিয়া" সম্প্রদায়ও এক ভিন্ন মননের ধর্মীয় আন্দোলনের সূচনা করে। দেশ জুড়ে "আনজুমান" তৈরির পেছনেও ছিল মুসলমান সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, ধর্ম আর সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করা, পাশ্চাত্য শিক্ষার আঁচ থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করা।

এক কথায় বলা যায়, ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই মুসলমানদের মধ্যে চলছিল নতুন চিন্তাভাবনার স্রোত। পরাজিত মুসলমান সমাজের শিরায় আত্ম-মর্যাদার তপ্তরক্ত প্রবাহিত করার সংগ্রাম। এ সবই ছিল ভিন্ন-ভিন্ন ধারার আন্দোলন; কোনো মোনো-লিথিক (অখণ্ডিত) আন্দোলন নয়। কিন্তু এই-সমস্ত আন্দোলন একটি মূলসূত্রদ্বারা গ্রথিত ছিল। এদের সুরটি ছিল এক ও অভিন্ন। এটা ছিল নিজের পরিচয়কে তুলে ধরার আর সমৃদ্ধ করার সুর। এটা ছিল মুসলমান সমাজের নিজস্ব সত্তা (আইডেনটিটি) প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এইসব বিভিন্ন ধারার আন্দোলন এবং ধর্ম সংক্রান্ত নানা পরীক্ষানিরীক্ষা ছিল তারই অভিব্যক্তি। ইংরেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অচলবদ্ধ্য মুসলমান সমাজে সে সময় যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ঢেউ নানাভাবে নানা খাতে পৌঁছেছিল। তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতে মুসলিম রাজনীতির নাড়া বাঁধা ছিল এই ধর্মীয় আন্দোলনের অনুশাসনে, যেমন হিন্দু রাজনীতির টিকি বাঁধা আছে উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ডিত রেনেসাঁসের সঙ্গে।

১৮৮৫ সালে তৈরি হল জাতীয় কংগ্রেস—মুখ্যত হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র। উর্দু আর হিন্দি ভাষা নিয়ে উত্তরপ্রদেশে শুরু হল দাঙ্গা। ধর্ম এবং প্রাচীন সংস্কৃতি-সভ্যতাকে অবলম্বন করে শুরু হল স্বদেশী আন্দোলন আর বিপ্লববাদ। ১৯০৫ সালে "বঙ্গভঙ্গে"র রাজনীতি হিন্দু আর মুসলমান সম্প্রদায়কে দুই বিপরীত মেরুতে ঠেলে দিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ হল।

কিন্তু মুসলমানরা হিন্দু-বিরোধিতার সাঁকো পেরিয়ে ইংরেজ শাসকদের কাছাকাছি চলে এল, ইংরেজের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তারা আসন সংরক্ষণ এবং পৃথক ভোটব্যবস্থার দাবি উত্থাপন করল। মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচয়-চেতনা নতুন মাত্রা পেল। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের বিকল্প সংগঠন হিসাবে মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করল। এতদিন যারা বৌদ্ধিক দিক থেকে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছিল, এবার তারা রাজনৈতিক পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করে। মহম্মদ আলির "কমরেড" আর "হামদর্দ" এবং জাফর আলির "জমিনদার" পত্রিকা দুটি মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনায় পলি সঞ্চয় করে।

আবুল কালাম আজাদের ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনা এই বিরাট পটভূমিতেই বিচার্য।

আজাদের জন্ম হয় ১৮৮৮ সালের ১১ই নভেম্বর, মক্কায়। পিতা শেখ মহম্মদ খেয়ারুদ্দিন দেলাভি। মাতা সুবিখ্যাত আরবি পণ্ডিত শেখ জাহারের কন্যা, মাতৃবংশসূত্রে আজাদের ধমনীতে আরবিরক্ত প্রবাহিত পিতা খেয়ারুদ্দিন ছিলেন একজন বিশিষ্ট সূফী পণ্ডিত। ১৮৯৮ সালে খেয়ারুদ্দিন তাঁর এক প্রিয় শিষ্য হাজি জাকারিয়ার বিশেষ আগ্রহে আর অনুরোধে পরিবার-বর্গকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন বসবাস করতে। পরের বৎসরই তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। আজাদ আর তাঁর ভাইবোনেরা মাতৃহীন হয়ে পিতার সুকঠোর শাসনে বড়ো হতে লাগলেন। খেয়ারুদ্দিন ইসলাম-ধর্মের গোঁড়া রীতিনীতি আর লৌহকঠিন নিয়মানু-বর্তিতা অনুসরণ করে পুত্রদের শিক্ষা প্রদান করেন। পিতা চেয়েছিলেন পুত্র মহিউদ্দিন তাঁরই মতন একজন পীর হিসাবে নিজেকে তৈরি করবেন এবং কেবল ইসলামকেই সারা জীবন জ্ঞানের চূড়ান্ত শিখর বলে মনে করবেন। বাইরের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের দরজা রুদ্ধ করে পিতা খেয়ারুদ্দিন তাঁর কঠোর পারিবারিক অচলায়তনের মধ্যেই পুত্রদের নিজেই শিক্ষা প্রদান করেন। ওয়ালিউল্লাহর প্রতিবাদী শিক্ষা ও সংস্কার আন্দোলন থেকে তিনি পুত্রদের আড়াল করে রাখলেন। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু মহিউদ্দিন পিতার কঠোর দৃষ্টি এড়িয়ে নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ গ্রহণ করতেন। স্যর সৈয়দ আহমদের পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগ ও যুক্তিবাদ, এবং ওয়ালিউল্লাহর সংস্কার আন্দোলনের বাণী বালক মহিউদ্দিনের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি পিতার প্রদত্ত একপেশে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করেন। মনে-মনে তিনি হয়ে উঠলেন তকলিদবিরোধী—যা কার্যত পিতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের শামিল।

পিতার প্রতি আজাদের শ্রদ্ধা ছিল অসীম। কিন্তু অন্ধভাবে তিনি তাঁর সমস্ত শিক্ষা মেনে নিতে পারেন নি। পিতার শিক্ষানৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখছেন :

My father was a man who believed in the old ways of life. He had no faith in western education and never thought of giving me an education of the modern type. He had thought that modern education would destroy religious faith...[১]

"আজাদ কি কহানী" নামক আত্মচরিতেও আজাদ তাঁর পিতা সম্বন্ধে নির্ভীক, সশ্রদ্ধ সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনার মধ্য দিয়েই আজাদ তাঁর মুক্ত চিন্তায় উত্তরণের ইতিহাসই বিবৃত করেছেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁর উত্তরণপর্ব সম্পন্ন হয়েছিল। ইসলাম সংক্রান্ত বিপুল তর্কবিতর্কের ঢেউ তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। পিতার কঠোর শাসনের পরদার ফাঁক দিয়ে বাইরের জগৎকে তিনি যতটুকু দেখতে পেরেছিলেন, তার আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। পিতার অজান্তে আধুনিক শিক্ষার আলোকস্পর্শে তাঁর মন একটু-একটু করে ঝুঁকে পড়ল

যুক্তিবাদের দিকে। আর একটু-একটু করে তিনি সরে এলেন পিতৃনির্দিষ্ট "লক্ষ্মণের গণ্ডি"র বাইরে। জ্ঞানবিজ্ঞানের এক জ্যোতির্ময় আলোক তাঁর অচলায়তনকে ভেঙে দিল।

কিন্তু সেখানেও আজাদের পূর্ণ মুক্তি ঘটল না। যুক্তিবাদ আর ঐতিহ্য—এই দুই ধারার দ্বন্দ্বে আজাদ ছিলেন বিদীর্ণ। যুক্তির পথ অনুসরণ করে তিনি প্রায় নিরীশ্বরবাদের ধারণার সমীপে উপনীত হলেন। তাঁর নিজের কথায় :

First the heart is steeped in the unconcern and insensibility of conventional and customary religion. Then come the pangs of doubt. ...Then doubt slowly leads to denial...In the end doubt took the form of denial and atheism. For a long time, I was lost in the valleys of confusion and of suspension of religion. For a long time, I took the mirage of materialism and rationalism as the water of life.[২]

দীর্ঘদিনের বিশ্বাস তাঁর মনে গভীরভাবে গ্রথিত ছিল। শুধু যুক্তি দিয়ে সমস্ত-কিছুকে বর্জন করার মানসিকতা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। তাই মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে অবিশ্বাসের সর্বনাশা কিনারায় পৌঁছেও তিনি পিছিয়ে এলেন। যুক্তির সঙ্গে ভক্তির সমন্বয়সাধনে ব্রতী হলেন।

স্যর সৈয়দের প্রভাবে আজাদ "তকলিদে"র বিরোধিতা শুরু করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্যর সৈয়দের প্রভাব থেকেও তিনি নিজেকে মুক্ত করলেন। এ সময় শিবলী নুমানীর (১৮৫৭-১৯১৪) স্নিগ্ধ প্রভাব তাঁকে শান্তি দিয়েছিল। শিবলীর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে আজাদ নতুন জীবনবোধে উজ্জীবিত হন।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কিছুদিন যুক্ত থাকলেও শিবলী যথার্থ আলিগড়-মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। স্যর সৈয়দ বিজ্ঞান ও ধর্ম, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ইসলামের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। শিবলী ছিলেন আবেগপ্রবণ ধর্মীয় নেতা। তিনি ধর্ম আর বিজ্ঞানের বৈবাহিক সম্পর্ক অস্বীকার করে-ছিলেন।

পারিবারিক পরিবেশ এবং পিতার অনুশাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেও এক গভীর একাকিত্ব-বোধে আজাদ ছিলেন বিষণ্ণ। শিবলী তাঁর জীবনের এই দুর্বল মুহূর্তে আবির্ভূত না হলে আজাদের জীবন ধারা কোন্ খাতে প্রবাহিত হত, সে-বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। আজাদ শিবলীর বন্ধুত্ব সম্পর্কে বলছেন :

I benefited greatly from that companionship. When the Maulana died, many great and lovely things were buried with him, the greatest of which was his fellowship that I have never experienced again with anyone.[৩]

শিবলীর ধর্ম ও রাজনৈতিক চিন্তা আজাদকে কতখানি স্পর্শ করেছিল সে সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। কিন্তু শিবলীর জীবনবোধ আর বিপুল পাণ্ডিত্য আজাদকে মুগ্ধ করে। তাঁর বুদ্ধির জগৎ থেকে পিতার নির্বাসন, আর স্যর সৈয়দ সম্পর্কে মোহমুক্তি—এই দুই ঘটনার পর শিবলীই ছিলেন আজাদের মানসিক আশ্রয়। দু-দুবার "তকলিদ"-বিরোধিতা করে আজাদ শিবলীকে আশ্রয় করলেও "তকলিদে"র বন্ধনে শিবলীর সঙ্গে তিনি আবদ্ধ হন নি। তবে একথা সত্য যে, আজাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রচনা এবং সাংবাদিকতার পেছনে শিবলীর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ছিল। শিবলীর সাহিত্যচর্চা আর রচনাশৈলী আজাদকে প্রভাবিত করেছিল। শিবলীর ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের জন্যও আজাদ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আজাদের "আল হিলাল" পত্রিকায় শিবলীর রচনাও প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু শিবলী নয়, আজাদের জীবনের একটি ব্যর্থ প্রেমের ঘটনাও তাঁর অন্তরমুখীনতার এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস পুনঃস্থাপনের জন্য দায়ী। এই ঘটনা ঘটেছিল আজাদের জীবনে বাইশ বছর বয়সে। এ ছাড়া, ১৯০৮

সালে পিতার মৃত্যুর পর আজাদের ধর্মীয় চেতনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। নানা পথ পরিক্রমা করে এবং একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির নির্দেশে আজাদ শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেন 'অতীন্দ্রিয়বাদী' (mystic)। তাঁর আত্মকাহিনীতে ("আজাদ কি কহানী") বলেছেন : 'অকস্মাৎ এক আশার আলো আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল। আমি যেমন বলতে পারি না কোথা থেকে একটি হাত এসে আমাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল, তেমনি আমি বোঝাতে পারব না—অকস্মাৎ অন্ধকার থেকে কোন্ হাত আমাকে আলোকে তুলে আনল।'[৪] তিনি আরও বলছেন, 'আমি এখন বুঝতে পারলাম যে ধর্ম (মজহাব) আর যুক্তি (আকল)—এই দুইয়ের ক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এবং উভয়ের পারস্পরিক অবস্থান এমনই যে একের সঙ্গে অপরের দ্বন্দ্ব ঘটাবার অবকাশ নেই।···মননশীল বোধির উপর ধর্ম যে বিশ্বের কথা বলে তার ক্ষেত্রে একমাত্র অতীন্দ্রিয় আবেগই (Jazba) প্রাসঙ্গিক।'[৫]

যুক্তিবাদের পথে আজাদ মনকে শান্ত করতে পারেন নি। বরং ধর্ম সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্নতা তাঁকে দিশাহীন করে। আবার যুক্তিকেও তিনি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারেন নি। এই স্ববিরোধিতার দ্বন্দ্বে আজাদ তাই ঈশ্বর আর ভক্তিবাদকে যুক্তির লাগাম থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস তিনি ব্যক্ত করেছেন এইভাবে : 'আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গুণাবলী যুক্তি দ্বারা বুঝতে পারব না। কেবলমাত্র আমাদের আবেগানুভূতির স্বাধীন আচরণের মাধ্যমেই আমরা সর্বশক্তিমানের নিকট পৌঁছতে পারি।'

এইভাবে আজাদ তার ধর্ম আর ঈশ্বরবিশ্বাসের পক্ষে একটি 'যুক্তি' দাঁড় করালেন। একটি নির্দিষ্ট পথে তিনি এবার যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর এই ধর্মীয় বোধের সঙ্গে যুক্ত করলেন রাজনৈতিক বোধ। ধর্ম ও রাজনীতি তাঁর কাছে হয়ে উঠল পরস্পরের সহযোগী।

কিন্তু আজাদের মানসিক গঠন ছিল যুক্তিবাদী। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করাই ছিল তাঁর অভ্যাস। তাই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আজাদ সম্পূর্ণভাবে যুক্তি বর্জন করতে পারেন নি। তিনি বলছেন : 'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর সমস্ত কর্মই একসূত্রে বাঁধা।' সুতরাং ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি—একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। নানা ধর্ম আর জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে আজাদ তাই ইসলামের বিরোধ খুঁজে পান নি। তিনি তাই ইসলামের একটি সার্বজনীন ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করেছেন সারা জীবন ধরে। ইসলাম সম্বন্ধে, ইসলামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজাদ বলছেন : 'আমি এটা অনুভব করলাম যে, ইসলাম নামে যে ধর্ম বিশ্ব স্বীকার করে, তা বিভিন্ন ধর্মের বিরোধের প্রকৃত সমাধান করতে সক্ষম। ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। ···এর উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের তাদের নিজ ধর্মের আদি ও অকলুষ সত্যের উপর স্থাপন করা এবং কৃত্রিমভাবে যুক্ত সমস্ত মিথ্যা উপাদানগুলি পরিত্যাগ করা। কোরানের ভাষায় এই-ই ইসলাম। ···ইসলাম খ্রীষ্টানকে প্রকৃত খ্রীষ্টান, ইহুদিকে প্রকৃত ইহুদি, পার্শিকে প্রকৃত পার্শি হতে বলে। একইভাবে তা হিন্দুদেরও তাদের আদি সত্যে উপর প্রতিষ্ঠিত হতে বলে। এইটাই ইসলাম নামে অভিহিত।'[৬]

ইসলাম সম্বন্ধে আজাদের এই অভিনব ব্যাখ্যা তাঁর যুক্তিবাদী সহিষ্ণু মানসিকতার পরিচায়ক। ইসলামকে তিনি বিশ্বজয়ের প্রথর তরোয়াল বলে মনে করেন নি। তাঁর ইসলাম-চেতনা ছিল ভক্তিরসে সমৃদ্ধ ও সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলার মন্ত্রে বিধৃত। আজাদের রাজনৈতিক জীবনে আর চেতনায় ইসলামের এই আদর্শই অটুট ছিল। আচার-বিচার আর সংস্কারের বাইরে যে ধর্মবোধ আছে, জন্মসূত্রে মুসলমান আজাদের কাছে এই ধর্মবোধই ছিল প্রকৃত ইসলাম। আজাদের মানসিক কাঠামোতে ইসলামের অন্যতর ব্যাখ্যা বা ভিন্নতর মুসলমান হওয়া সম্ভব ছিল না। সামন্তযুগীয় ভাবনা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে

পারেন নি, আবার বুর্জোয়া যুগের নতুন ভাবনার দাবিকেও উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পদে-পদে তিনি এই দুইয়ের অর্থাৎ ঐতিহ্য আর আধুনিকতার সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই চেষ্টা অনেকটাই তাঁর নিজের দ্বিধাদীর্ণ মনের ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস। সাধারণ কোনো মৌলানার পক্ষে এ চেষ্টা সম্ভব নয় এবং অর্থহীন। তাই এ ক্ষেত্রে আজাদকে সম্যক বিশ্লেষণ করার কাজটাও খুব সহজ ছিল না তার সমধর্মী মানুষদের পক্ষে।

আজাদ অনুভব করলেন যে, ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মমর্যাদায় আর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিদেশী শাসনের অবসান একান্তই কাম্য। তিনি অনুভব করলেন, রাজনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে না পারলে ধর্মীয় মুক্তিও সম্ভব নয়।

রাজনীতিকে ধর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করার কালচার আমাদের দেশে তখনও আসে নি। মৌলানা আজাদকেও তাই অন্যভাবে বিচার করার কোনো কারণ নেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামী অরবিন্দ ঘোষও রাজনীতিকে সমযুক্ত করেছিলেন ধর্মের সঙ্গে। তিনিও স্বরাজ- এবং মোক্ষ-লাভের জন্য যোগসাধনা আর স্বাধীনতার লড়াইকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। স্বাধীনতার জন্য তিনি বাঙলার যুবশক্তিকে আত্মব্রহ্ম ও শাক্ত ধর্মের সাধনায় নিযুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন : 'জাতীয়তাবাদ রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি নয়; জাতীয়তাবাদ ভগবানসম্ভূত ধর্ম।···ভগবৎশক্তিতেই জাতীয়তা টিকে থাকবে।'

হিন্দু মুসলমান একই দেশমাতৃকার দুই সন্তান। এই দেশমাতৃকার প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই হিন্দু যুবকদের মুসলমানদের প্রতি ভ্রাতৃবোধ ও অনুরাগ জন্মাবে—এটাই ছিল অরবিন্দর ধারণা। হিন্দুধর্মের লক্ষ্যপূরণ তাঁর ঈপ্সিত হলেও মুসলমান সম্প্রদায় বা ইসলাম ধর্মকে অরবিন্দ তাঁর পথের অন্তরায় বলে মনে করেন নি।

মৌলানা আজাদও ঠিক একই ধর্মচিন্তা থেকেই রাজনীতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন, এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে স্বদেশবোধ আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন। এরই পরিবর্ধিত এবং আরও উন্নত রূপ দেখি গান্ধীজীর ধর্মচিন্তায় আর রাজনীতিতে। অর্থাৎ ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতীয় আন্দোলনের ঐক্যসাধনে গান্ধীজীর প্রয়াস মূলত অরবিন্দ বা আবুল কালাম আজাদের চিন্তার উত্তরপর্ব।

মৌলানা আজাদ মুসলমান সম্প্রদায়কে তাদের জড়তা থেকে উদ্ধারের প্রয়াসে "আল হিলাল" (জুলাই ১৯১২) পত্রিকা প্রকাশ করেন। "আল হিলাল" প্রকাশিত হয় এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে। ইউরোপের হাতে তুরস্কের লাঞ্ছনা এবং বলকান যুদ্ধের ফলে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়, মুসলমান নেতৃবৃন্দকে করে বিচলিত। মহম্মদ আলির "কমরেড" আর "হামদর্দ" এবং "জমিনদার" পত্রিকা মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলমানরা নূতন করে নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ঘটনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বঞ্চনাবোধ প্রবলতর হল। এই রাজনৈতিক পরিবেশে ১৯১২ সালে "আল হিলাল" পত্রিকার আবির্ভাব। এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মুসলমানদের কাছে কোরআনের মূল বাণী পৌঁছে দেওয়া, এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে মানসিকভাবে মুসলমান সম্প্রদায়কে সংগঠিত করা। ধর্ম আর রাজনীতিকে এক শক্তিশালী, অনবদ্য শিল্পময় ভাষায় তিনি সাধারণ মুসলমানদের কাছে সহজেই পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা সপ্তাহে পঁচিশ হাজার অতিক্রম করে যায়। আজাদের লক্ষ্য ছিল ধর্মের মধ্য দিয়ে মুসল-

মানদের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতার যোগ্য করে মুসলমানদের সংগঠিত করা। তখনও পর্যন্ত আজাদের ধারণা—একমাত্র ধর্মের বেদি থেকে আহ্বান জানালেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হবে। ধর্মই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো কর্তৃত্ব (অথরিটি)।

এই কারণেই আজাদ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের মুসলমানদের সর্বোচ্চ ইমামের পদে অধিষ্ঠিত হতে। ইসলামের সত্যকার বাণীকে মুসলমানদের মধ্যে পৌঁছে দিতে, মুসলমানদের প্রকৃত জেহাদে উদ্বোধিত করতে হলে সুউচ্চ ইমামের পদে দাঁড়িয়েই সবচেয়ে সহজে তা করা সম্ভব—এই ছিল আজাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মূলত ধর্মভিত্তিক পত্রিকা হলেও ইংরেজ-বিরোধিতার তীব্রতার জন্য "আল হিলাল" ইংরেজ শাসকদের বিরূপ করেছিল। নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে, কূট আইনের আশ্রয় নিয়ে সরকার পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দিল। পুরানো পুলিসি নথিপত্রে এই পর্বের আজাদের কর্মকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িক বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আজাদ কিন্তু দমলেন না। তিনি নতুন পত্রিকা প্রকাশ করলেন—"আল বালাগ" (বজ্রনির্ঘোষ)। মিশরে আবদুর শিষ্যবর্গের ও তুরস্কের কামাল পাশার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আজাদ "হিজ্‌বুল্লা" (ঈশ্বরের দল) গঠন করার পরিকল্পনা করেন। "আল বালাগ" পত্রিকায় আজাদ প্রথম তাঁর পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। ব্যবসায়ী, দোকানদার, অগণিত সাধারণ মুসলমান আজাদের এই প্রয়াসকে স্বাগত জানান, অর্থসাহায্য করেন। বহু যুবক, এমনকী মুসলিম রমণীরাও এই দলের অন্তরভুক্ত হওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। আজাদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মুসলিমদের আন্দোলনকে যুক্ত করা। এই সময় তিনি ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করারও আহ্বান জানিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) আন্দোলনের সময় সমস্ত দেশ জুড়ে যে জাতীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল, আজাদকে তা আকৃষ্ট করে এবং এই সময় বড়োদা থেকে অরবিন্দ কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গেও তিনি কয়েকবার যোগাযোগ করেন। অরবিন্দর "কর্মযোগিন্" পত্রিকা সম্বন্ধে তিনি বলছেন :

'His paper Karmayogin became a symbol of national awakening and revolt'.[৭]

আজাদ হিন্দু গুপ্ত-সংগঠনগুলির সঙ্গেও যোগাযোগ করেন; এবং আবিষ্কার করেন যে, প্রতিটি সংগঠনই "মুসলমানবিরোধী"। আজাদ কিন্তু হিন্দু গুপ্ত সমিতিগুলির মুসলিমবিরোধী মানসিকতার জন্য তাদের প্রতি বিরূপ হলেন না। তিনি তাঁর বিশ্লেষণ দিয়ে এদের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করলেন, এবং এদের অনেককেই এ কথা বোঝাতে সমর্থ হলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের স্বাধীনতা সম্ভব। আজাদ বলছেন :

They saw that the British Government was using the Muslims against India's political struggle and the Muslims were playing the Government's game.[৮]

ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ঘটাবার জন্য, পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্য হিন্দু বিপ্লববীদের দমন করার কাজে উত্তর প্রদেশ থেকে মুসলমান পুলিশ নিয়োগ করতে লাগল। আজাদ বলছেন :

The result was that the Hindus of Bengal began to feel that Muslims as such were against political freedom and against Hindu community.[৯]

আজাদ অনুভব করলেন ও গুপ্ত সমিতিগুলিকে বোঝালেন :

The Muslims of India would also join in the political struggle if we worked among them and tried to win them as our friends. I also pointed out that active hostility, or even in difference of Muslims, would make the struggle for political liberty more difficult. We must therefore make every effort to win the support and friendship of the community.[১০]

হিন্দু সমিতিগুলির মুসলমানদের প্রতি যে অবিশ্বাস জন্মেছিল, আজাদ মুসলমান হয়েও তা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তাঁর প্রখর যুক্তিবাদী আর সংবেদনশীল উন্নত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজ পুলিশের খাতায় সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হলেও আজাদ ছিলেন দেশপ্রেমিক ও মুসলমান। সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী স্বদেশী যুবক।

কলকাতায় বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে তাঁর বাসভবনে আজাদ "দারউল ইরসাদ" নামে একটি গোপন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন (১৯১৫)। ইসলামের শিক্ষা আর বাণী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার করার উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমান যুবকদের বিশেষ শিক্ষা প্রদান করতেন। শুধু ধর্মপ্রচার আজাদের লক্ষ্য ছিল না; আজাদের লক্ষ্য ছিল বিদেশীদের বিতাড়ন করা। কিন্তু আজাদ যখন ব্রিটিশ-বিরোধিতা আর জেহাদের কথা প্রচার করছেন তখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে ইসলামের বলয়ের মধ্যেই তা সম্পন্ন করতে চাইছেন। রাজনৈতিক সংগ্রাম ও লক্ষ্যপূরণ করার জন্য একদিকে তিনি যেমন প্রাচীনপন্থী উলেমাদের পরিত্যাগ করেছেন, তেমনি আলিগড় তথা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত মুসলিম নেতাদেরও তিনি নেতা বলে মানতে পারেন নি। ইমামের পদমর্যাদায় অভিষিক্ত কোনো ব্যক্তি ব্যতীতঅন্য কাউকে তিনি মুসলমানদের ত্রাতার ভূমিকায় দেখতে নারাজ ছিলেন। খিলাফত আন্দোলনের একজন উগ্র সমর্থক আজাদ অবশ্য নিজেকেই মুসলিম সমাজের একজন প্রধান নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯২১ সালে লাহোরে জমায়েত উল্-উলেমা সম্মেলনে তিনি সভাপতির আসনও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু গোঁড়া উলেমারা আজাদের প্রার্থী-পদ সমর্থন না করায় তিনি "আমীর"পদে বৃত হতে পারেন নি। এই পর্বে আজাদের চিন্তাভাবনা ছিল ধর্মীয়-যুক্তি দ্বারা সীমাবদ্ধ। তখনও আজাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা পরিপুষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ভাবনা তখনও পরিষ্কার নয়। জেহাদি আজাদের রক্তে তখনও সন্ত্রাসবাদের রোমানটিসিজম। আজাদের জাতীয়তাবাদ ইসলামের চিন্তাভাবনায় জারিত, ইমাম ব্যতীত সারাদেশে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য শ্রদ্ধেয় নেতা আর কেউ ছিলেন না।

এই অবস্থাতেও আজাদ মুসলমান আর অমুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথাই ভেবেছিলেন। এমনকী ইমামের শাসনকেও গণভিত্তিক করার কথা বলেছিলেন। "আল হিলাল" পত্রিকায় তাঁর যুক্তির সমর্থনে শেখ উল উসলামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন,

The Sharia has attached the condition to all the commands of the Imam that they be in the public interest.....From this follows that criticism is permissible and counsel is essential .....If amomg the (non-Muslim) protected people there are dependable persons whose knowledge, honesty, motives, and selfless service can be relied upon, the Imam cannot exclude them from the governing body.[১১]

আজাদের চরিত্র ছিল উদার মানবিকতা আর গণতান্ত্রিক কাঠামোয় গঠিত। তিনি ছিলেন মূলত যুক্তিবাদী। সাম্প্রদায়িকতা বা গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চরিত্রে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে, ঢাকা শহরে মুসলিম লীগের উদ্বোধনী সম্মেলনে (৩১ ডিসেম্বর, ১৯০৬) আজাদের উপস্থিতি নিয়ে কোনো-কোনো মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। আজাদ কিন্তু লীগের সদস্য বা সমর্থক কখনই ছিলেন না। তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বেতনভুক্ সাংবাদিক হিসাবেই সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া, সেই সময় মুসলমানদের নিয়ে যা কিছুই হচ্ছে আজাদের তাতে ছিল আগ্রহ আর জিজ্ঞাসা, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম লীগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আর ইংরেজ-প্রীতি, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'সাহেব' মুসলমানদের আজাদ পছন্দ

করতে পারেন নি। শুধু মুসলমান বলেই যে কোনো প্রস্তাব বা দাবি আজাদের অনুমোদন পেত না। অথচ অসাম্প্রদায়িক হবার জন্য আজাদকে মেকি প্রগতিশীলতার কবচ ধারণ করতে হয় নি।

আজ বঙ্কিমচন্দ্র-অরবিন্দকে নিয়েও নূতন করে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা শেষপাদেও ধর্মবর্জিত জাতীয়তাবাদ কতখানি সম্ভব ছিল, তা পুনর্বিবেচনার যোগ্য। আমাদের রেনেসাঁস ছিল খণ্ডিত রেনেসাঁস। ধর্মকে বাদ দিয়ে আমাদের দেশে কোনোদিনই কোনো আন্দোলন সার্থক হয় নি। বঙ্কিম, অরবিন্দ জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে ধর্মকে নির্বাসন দেন নি। হিন্দুধর্মের ভাণ্ডার থেকেই তাঁরা জাতীয়তাবাদের রসদ জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলেন। আজাদ মুসলমান ছিলেন বলেই ইসলামের মধ্যেই তাঁর যুক্তিবাদ আর মননশীলতার গঠন হয়েছিল। হিংসা- বা বিদ্বেষ-জাত সাম্প্রদায়িক চিন্তা এঁদের মনে কোথাও স্থান পায় নি। অবশ্য ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে জাতীয়তাবাদের চিন্তাভাবনার কতকগুলো স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা থাকবে। সেটা অন্য প্রশ্ন।

খিলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজাদ ক্রমশ বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করেন। ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে নূতন করে স্বাধীনতা আর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-ভাবনা উপলব্ধি করেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় কারাবাসের সময় থেকে আজাদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আজাদ সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা থেকে আজাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন লক্ষ করা যায়।

"আল হিলাল" পর্বের জেহাদ আজাদকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মীয়ভাবে অধৈর্য করে তুলেছিল। স্বাধীনতাই ছিল তাঁর প্রধান আর প্রথম লক্ষ্য। কিন্তু গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসে, এবং খিলাফত আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আজাদ উপলব্ধি করলেন যে কোনো মহার্ঘ বস্তু লাভ করতে হলে প্রয়োজন ধৈর্য আর অধ্যবসায়; সহজ পথে তা লাভ করা যায় না। তিনি গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে অনুসরণ করলেন। তিনি এও উপলব্ধি করলেন যে, স্বাধীনতার চেয়ে অনেক বড়ো বস্তু যা আগে লাভ করতে হবে তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য। কংগ্রেসের অধিবেশনে আজাদ বললেন: 'হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ব্যতীত শুধু আমাদের স্বাধীনতাই অসম্ভব নয়, একে বাদ দিয়ে আমরা আমাদের মধ্যে মানবতার প্রাথমিক নীতিগুলিও সৃষ্টি করতে পারব না। আজ যদি আকাশ থেকে কোনো দেবদূত অবতীর্ণ হয়ে দিল্লীর কুতুব মিনার থেকে ঘোষণা করেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চুলোয় দাও, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমাদের স্বরাজ পাবে, আমি স্বরাজের পরিবর্তে বরং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই আকাঙ্ক্ষা করব। কারণ স্বরাজলাভে বিলম্ব হলে তাতে শুধু ভারতের ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাদের ঐক্য তিরোহিত হলে সমগ্র বিশ্বমানবের ক্ষতি হবে।'

কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হলেও ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আজাদের রাজনৈতিক উত্থান তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। রাজনৈতিক জগৎ তখনও আজাদকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নি। সাহিত্যিক ও ধর্মপ্রাণ আজাদ তখনও শুকিয়ে যান নি। তারই উজ্জ্বল পরিচয় আমরা পাই তাঁর রচিত বিখ্যাত কোরআন-ভাষ্য। আজাদের এ এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

কোরআনের নতুন ভাষ্য রচনা করা আজাদের দীর্ঘ দিনের সংকল্প ছিল। ভারতীয় মুসলমানদের জীবন সমস্ত দিক থেকে উন্মোচিত করার প্রয়াসে তিনি কোরআনের বাণীকে সাধারণের কাছে যুগ-উপযোগী করে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ১৯১৫ সাল থেকেই তিনি এ চেষ্টা করে গেছেন। বিভিন্ন সময়ে ইংরেজের জেলে অন্তরীণ থাকার সময়ে কোরআন-ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে

গেলেও আজাদ অসীম ধৈর্য আর একাগ্রতায় কোরআনের ওপর তাঁর বিরাট কর্ম আমাদের উপহার দেন—যদিও শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে ক্রমশ বেশি-বেশি করে ব্যাপৃত হয়ে পড়ায় সে-কাজ তিনি সম্পূর্ণ করেন নি; অথবা বলা যায়, কোরআন নিয়ে কাজ করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু কোরআনের মূল বাণী তিনি যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তা শেষ দিন পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার রসদ তিনি কোরআন থেকেই গ্রহণ করতেন। কোরআন ছিল তাঁর রাজনৈতিক ধর্মগ্রন্থ।

কোরআন রাজনৈতিক ধর্মগ্রন্থ হলেও আজাদ ছিলেন সংস্কারমুক্ত। রিচ্যুয়াল বা জপতপের ধর্ম তাঁর পথ ছিল না। আজাদ কোরআনের বাণী ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, বিশ্বাস আর সৎকর্মের উপরই মুক্তি নির্ভর করে। গোষ্ঠীবদ্ধতা বা বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তি আসে না। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে নিজের বিশ্বাস আর ধ্যানের মাধ্যমেই তা সম্ভব। এর জন্য কোনো মোল্লার প্রয়োজন নেই। আজাদ কোরআনের সার্বজনীন চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলছেন:

The universal guidance of divine revelation which is present in the world from the very first day and is for all men without difference or distInction.

দেশবিভাগের বিরোধিতা করতে গিয়ে বা পাকিস্তানকে পবিত্রভূমি বলে অস্বীকার করতে গিয়েও আজাদ কোরআনের মূল বাণীকেই স্মরণ করেছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল এইরকম যে, গোটা বিশ্বই ঈশ্বরের সৃষ্টি। গোটা বিশ্বই তাঁর কাছে পবিত্রভূমি এবং উপাসনালয় (মসজিদ)। কোনো বিশেষ অঞ্চলকে অন্য অঞ্চল থেকে পৃথক করে পবিত্র ঘোষণা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। গোটা ভারতবর্ষই পবিত্র।

সর্বধর্মসমন্বয় বা "ওয়াদত-ই-দিন্"-এর কথা আজাদ ভেবেছিলেন। কিন্তু সাধুসন্ত বা ফকিরের মতন ধর্মচিন্তা আজাদের ছিল না। আজাদ চেয়েছিলেন রাজনীতি ও ধর্মের মিলন—যার লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা অর্জন। এই স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য একটি মিলনভূমি। আজাদের ধর্মচিন্তা এই মিলনভূমি রচনার চিন্তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত।

প্রথম জীবনে আজাদ চেয়েছিলেন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে। কোরআন বা ধর্ম তাঁকে জুগিয়েছিল তাত্ত্বিক রসদ। মুসলমানের ধর্ম শুরু থেকেই রাজনীতি-সম্পৃক্ত। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে দেশের কথা প্রচার করতে গিয়ে আজাদ ধর্মকে বাদ দিতে পারেন নি। কিন্তু বৃহত্তর রাজনীতির অভিজ্ঞতায় আজাদ ক্রমশ উপলব্ধি করলেন—শুধু মুসলমান জাগরণ নয়, এই উপমহাদেশে নানা ধর্মের, বিশেষ করে বিশাল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে কাঁধমিলিয়ে চলতে না পারলে ইংরেজবিতাড়ন অসম্ভব। আজাদ এই মিলনভূমি রচনার কর্মে একটি নিজস্ব সূত্র প্রদান করেছেন।

তিনি অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অবাস্তব প্রস্তাব দেন নি। তাঁর ব্যাখ্যায় পৃথিবীর সব ধর্মের আদিতে একই মর্মবস্তু ছিল। বিভিন্ন সময়ে পরবর্তী কালে সমস্ত ধর্মেরই মূল থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ যদি তাদের ধর্মের মূলে ফিরে যান তবে ইসলামের সঙ্গে তাদের কোনো বিরোধ বা অসঙ্গতি থাকবে না। এভাবেই আচার-বিচারের শৈবালে আটকে-পড়া ধর্ম থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে। ইসলামের সঙ্গেও তাদের কোনো বিরোধিতা থাকবে না।

অন্য এক জায়গায় আজাদ মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি আরও বেশি মাত্রায় সহনশীল হতে। উপদেশ দিচ্ছেন অন্যধর্মকে বোঝার এবং সেই অনুসারে তার আচরণবিধি সংহত করার।

...if even an idolator honour and worship God in his own way, he should not be shown disrespect, for the honour and worship of God

is, in any event, the honour and worship of God.

গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও তিনি পরিষ্কার কথা বলেছেন :

There is no virtue in that staunch adherence to some view, if it obliges you to refuse to listen to what others have to say.

তিনি মনে করতেন আপন প্রত্যয়ের প্রতি স্থির থাকা আর অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য এক বস্তু নয়। এমনকী তারজুমান কোরআনে প্রধানত তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণীর ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ থেকেছেন। পয়গম্বরের জীবন-ব্যাখ্যা বা জীবন-আলোচনায় তেমন উৎসাহ দেখান নি। প্রচারকের চেয়ে প্রচারিত বাণীই তাঁর কাছে মুখ্য। এজন্য উলেমারা আজাদের কোরআন ব্যাখ্যাকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি। একজন মুসলমান হয়ে আজাদের এই আচরণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, সাহসিকতার পরিচায়ক। এইখানেই তিনি স্বতন্ত্র আর স্বাধীন। তাঁর প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ উলেমাদের কাছে এবং সাধারণ মুসলমানদের কাছে তাঁকে জনপ্রিয় করে নি। মুসলমান হয়েও এবং মুসলমানদের সম্পর্কে সবচেয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেও তিনি মুসলমান গণমানসের কাছে একটি বিস্ময় ; দুরজ্ঞেয় ব্যক্তিত্ব। সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা তাঁকে মনে করতেন "হিন্দুদের চর" ও "বিশ্বাসঘাতক" আর সাধারণ মুসলমানরা তাঁকে বুঝতেই পারেন নি। হিন্দুরা তাঁকে বুঝতেই পারেন নি। হিন্দুরা তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন মুসলমান পণ্ডিত হিসাবে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একজন "জাতীয়তাবাদী মুসলমান" হিসাবে। হিন্দুদের পক্ষে আজাদকে বোঝা ছিল আরও দুষ্কর।

মুসলমানদের স্বার্থ চিন্তা এবং মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা আজাদের চেয়ে গভীরভাবে গান্ধীজী ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো নেতার মধ্যে দেখা গেছে কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। বৃহত্তর ভারতীয় স্বার্থের পটভূমিতেই আজাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। বিশাল হিন্দু জনগণের মধ্যে বাস করে সংখ্যালঘু হিসাবে তাঁর কোনো আত্মদীনতা জন্মায় নি। মুসলমান হিসাবে তিনি হিন্দুবিরোধী শক্তির সঙ্গে আঁতাত করেন নি, আবার দেশপ্রেমের শুদ্ধতা প্রমাণের জন্য তাঁকে হিন্দুদের কোল ঘেঁষে বসতে হয় নি। তিনি অকপটে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার কথা বলতেন এবং মুসলমান হিসাবে গর্ববোধ করতেন।

১৯৩৯ সালে "National Tahreek" নামে আজাদ একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন যা বহুল প্রচারিত নয়। সেই পুস্তিকায় জাতীয় সমস্যা ও মুসলমানদের সম্বন্ধে আজাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সে সময় সম্পূর্ণানন্দজী হিন্দু-মুসলমানের সমস্ত পার্থক্য মুছে ফেলে নূতন শিক্ষা প্রদানের কথা বলেছিলেন। আজাদ এই অবাস্তব পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন :

The Muslims must declare boldly that they are not prepared to be absorbed into Hinduism even for a moment. They will not only protect their characteristics as Muslims but try for their development.

ভারতবর্ষকে স্বদেশ হিসাবে ভালোবাসবার জন্য মুসলমানদের অমুসলমান হবার তাগিদ কখনই তিনি বোধ করেন নি। ১৩০০ বছরের ইসলামের ঐতিহ্য যা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন, সেই ঐতিহ্যের 'সামান্য অংশও পরিত্যাগ করতে' তিনি রাজি ছিলেন না। কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন থেকেও তিনি বলতে পারেন : 'ইসলামের শিক্ষা ও ইতিহাস, শিল্পকলা ও সভ্যতা আমার মূল্যবান সম্পদ। একে রক্ষা করা আমার পবিত্র কর্তব্য।' তাঁর দেশপ্রেম, অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি যে ভালবাসা বা "ভাবাবেগ", তার সঙ্গে ইসলামের প্রতি "স্বাভাবিক অনুভূতির"

কোনো সংঘাত ছিল না। তাই তিনি একই সঙ্গে বলছেন : 'আমি একজন ভারতীয় হওয়ায় গর্বিত। আমি ভারতীয় মিশ্র জাতীয়তাবাদের অবিভাজ্য অংশ এবং আমাকে বর্জন করে বিরাট ভারতীয় সৌধ-নির্মাণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি এই কাঠামোর একটি অপরিহার্য উপাদান এবং আমি আমার এই অধিকার কখনোই পরিত্যাগ করতে পারি না।'[১২]

শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগ গঠনের প্রথম থেকেই আজাদ বিরোধী ছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় হিসাবে না ভেবে শুধু মুসলমান প্রতিপন্ন করার বিপদ তিনি বহু আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেশবিভাগের রাজনীতি বা শুধু রাজনৈতিক সুবিধার জন্য মুসলমানদের ব্যবহার করার রাজনীতির তিনি পক্ষে ছিলেন না। এই রাজনীতি শুধু মুসলিম লীগ নয়, কংগ্রেসকেও আচ্ছন্ন করেছিল। তাই দীর্ঘকাল (১৯৩৯-১৯৪৬) কংগ্রেস সভাপতি থেকেও আজাদ কংগ্রেসকে তার চিন্তা-ভাবনার কাঠামোয় গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। জিন্না প্রমুখ মুসলমান নেতাদের পক্ষে আজাদকে তাই কংগ্রেসের "শোভয় প্রেসিডেনট" বলে প্রচার করার সুবিধে হয়েছিল।

আজাদ অখণ্ড ভারতের কথা ভাবতেন যতখানি ভারতবর্ষের স্বার্থে, ততখানি মুসলমানদেরও স্বার্থে। আজাদ উপলব্ধি করেছিলেন, দেশভাগের পর সংখ্যা-লঘু হিসাবে মুসলমানরা বিপন্ন বোধ করবে। তারা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করবে যে, যে দেশে তারা এতকাল বাস করে আসছে, সেই দেশেই তারা রাতারাতি বিদেশীতে পর্যবসিত হয়েছে : 'They will be left to the mercies of what would become an unadulterated Hindu Raj.[১৩]

অনেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চেষ্টা আর সদিচ্ছা সত্ত্বেও আজ যে ভারতবর্ষ বিপুল হিন্দুত্ব ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খণ্ডতার দিকে ধাবমান, তা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐতিহাসিক পাপেরই পরিণতি। এই ভয়ংকর পরিণতির চিন্তা আজাদকে গ্রাস করেছিল। তাই আজাদের রাজনীতি কোনোদিনই সংকীর্ণ স্বার্থে পরিচালিত ছিল না। অথচ মুসলমান-দের স্বার্থ আর মুসলমান মানসিকতাকে তাঁর চেয়ে বেশি গভীরভাবে উপলব্ধি করা আর কোনো কংগ্রেস নেতার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনকী জওহরলাল নেহরুর পক্ষেও না। তাঁর সম্পর্কে আজাদ বলেছেন Jawaharlal has a weakness for theoretical considerations' কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল 'উদার ও উষ্ণ'।

দুর্ভাগ্য এই যে জিন্নার সাম্প্রদায়িক আহ্বান থেকে মুসলমানদের তিনি ফেরাতে পারেন নি। এর জন্য প্রধানত "হিন্দু" কংগ্রেসের কার্যকলাপ-ই দায়ী, অংশত জিন্না। জিন্নার প্রতি আজাদের বিরূপতা এত তীব্র ছিল যে, জিন্নার রাজনৈতিক উত্থানের জন্য তিনি গান্ধীজীকেই দায়ী করেছেন। তাঁর অভিযোগ : 'গান্ধীজী জিন্নার পেছন পেছন ছুটেছেন এবং তাঁকে তুষ্ট করেছেন।' গান্ধীজী জিন্নাকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দান করে মুসলমানদের কাছে জিন্নার ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছেন। এটাই ছিল আজাদের ধারণা।

আজাদের এই বিশ্লেষণ অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মুসলমানদের কাছে জিন্নার অপ্রতিরোধ্য আবেদন আর প্রভাব আজাদকে ঈর্ষান্বিত করেছিল কিনা, তা গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যোগ্য।

বাস্তববোধসম্পন্ন আজাদ পাকিস্তান সৃষ্টির পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন :

...It is harmful not only for India as a whole but for Muslims in particular. And in fact it creates more problems than it solves... Two states confronting one another offer no solution to the problem of one another's minorities but only lead to retribution and reprisals

by introducing a system of mutual hostages...

ধর্মের ভিত্তিতে ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে সংগঠিত করে ইতিহাসে কখনই একটিমাত্র রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে নি। তিনি মনে করতেন :

It is one of the greatest frauds on the people to suggest that religious affinity can unite areas which are geographicalhy, economically, linguistically and culturally different .. History has however proved that after the first few decades or at most after the first century, Islam was not able to unite all Muslim countries into one state on the basis of Islam alone.

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তবতা এবং স্থায়িত্ব নিয়েও তাঁর সংশয় ছিল। আজ আজাদের চিন্তাভাবনাগুলি নির্মম সত্য হয়ে প্রকাশিত। পূর্ব-পাকিস্তান আজ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন ; নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এ সত্য কংগ্রেসের ও দেশের অন্যান্য নেতারা নিশ্চয়-ই বুঝেছিলেন। কিন্তু আজাদের মতন স্পষ্ট করে তা উচ্চারণ করার সাহস দেখান নি।

আজাদের গোটা জীবনটাই ছিল 'মূল্যবোধ'-ভিত্তিক রাজনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সমস্ত প্রশ্নেই আগে নিজের বিচার-বিশ্লেষণ ও মন প্রয়োগ করতেন—যা তাঁর অনেক সহকর্মীই এড়িয়ে চলতেন। এমনকী ছোটোখাটো বিষয়েও আজাদ মূল্যবোধের অগ্রাধিকার দিতেন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে গান্ধীজীর উপদেশ বা নির্দেশও তিনি উপেক্ষা করতেন এবং সরাসরি গান্ধীজীকে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। তাঁর সহকর্মীদের সম্বন্ধে তিনি জানাচ্ছেন :

I have always had the feeling that these colleagues and friends did not exercise their own minds on most political issues. They were out-and-out followers of Gandhiji. Whenever a question arose they waited to see how he would react...I could not for a moment accept the position that we should follow him blindly.[১৪]

তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আজাদের সখ্য গড়ে ওঠে নি। নিজেকে তিনি অনেক উঁচু বেদীতে সমারূঢ় রেখেছিলেন। তিনি গান্ধীজীর পথের পথিক হলেও অন্ধ-ভক্তদের মধ্যে গম্য হতেন না। আবার সমাজতন্ত্রীদের মতন গান্ধী-ভজনা ও গান্ধী-বিরোধিতার বিপরীত মেরুতেও দোদুল্যমান সুবিধাবাদী ছিলেন না। আসলে 'তক্‌লিদ্'-বিরোধিতা আজাদের জীবনে শেষ দিন পর্যন্তই ছিল।

জওহরলালের মতন আজাদের বাস্তব রাজনীতিতে 'তাত্ত্বিক ঝোঁক' ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও সমাজতন্ত্রের মূল সূত্রগুলোকে মেনে নিয়েছিলেন। 'অবাধ বাণিজ্য' নীতির ফলে যে সামাজিক অসাম্য-সৃষ্টি হয় তা স্বীকার করেছিলেন এবং ইসলাম ও 'সমতার' (equality) ধারণায় কোনও বিরোধ খুঁজে পান নি।

ভারতের নিজস্ব সামাজিক আর ঐতিহাসিক পটভূমিতে আজাদ সংসদশাসিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যগুলির হাতে থাকবে প্রভূত ক্ষমতা বা স্বাধিকার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এই স্বাধিকারের মাধ্যমেই আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সুযোগসুবিধা অর্জন করবে এবং এর ফলে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংঘাতও স্তিমিত হয়ে আসবে। ক্যাবিনেট মিশনের কাছে আজাদ তাঁর চিন্তাভাবনা ব্যক্ত করলে পেথিক লরেন্স মন্তব্য করেছিলেন : 'you are in fact suggesting a new solution of the communal problem.' ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান আজাদ দেখেছিলেন। কিন্তু নানা রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ ও আঁককষার ফলে শেষ পর্যন্ত ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত

হল না। এ পর্বে আজাদ মুসলমানদের জন্য যেভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন তা গান্ধীজীও অনুমোদন করেন নি। গান্ধীজীও যখন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে দেশভাগ সমর্থন করলেন তখন আজাদ ও পাখ্‌তুন নেতা খান্ আব্‌দুল্ গফ্‌ফর খান্ সবচেয়ে বেশি মর্মাহত, বিস্মিত হয়েছিলেন।

সমস্ত জীবন ধরে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধনে ও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার সংকল্পে ব্রতী আজাদের শেষ ভরসা ও স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল। কংগ্রেস সভাপতির পদ পরিত্যাগ করার পর (১৯৪৬) তিনি আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন নি।

মাত্র চার বৎসর বয়স্ক পুত্রকে এবং কারাবাস-কালে পত্নীকে হারিয়ে (১৯৪৪) পারিবারিক জীবনে নিঃস্ব আজাদ রাজনৈতিক সঙ্গীহীন হয়ে জীবনের শেষ কয়েকটি বছর স্বাধীন খণ্ডিত ভারতের সর্বাপেক্ষা দুঃখী মানুষ হিসাবে দিন কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু আদর্শ ও চিন্তাধারা পরিত্যাগ করেন নি। তাঁকে কার্যত সবাই পরিত্যাগ করে গেলেও তাঁর চিন্তাভাবনা ও স্বদেশ-চেতনা আজকের ভারতবর্ষে প্রকটভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

আজাদ আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখেছিলেন তিনটি : (ক) "তাজকিরা"—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অন্তরণ অবস্থায় ; (খ) "আজাদ কি কহানী খোদ আজাদ কি জবানি"—১৯২০ সালে বন্দী অবস্থায় সহবন্দী মালিহাবাদিকে বলে-যাওয়া জীবনেতিহাসের অনুলিখন ; (গ) "ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম"—প্রকাশকাল ১৯৫৯।

সূত্রনির্দেশ :

১। ই. উ. ফ্রী.
২। আজাদ কি কহানী
৩। ওই
৪। ওই
৫। ওই
৬। ওই
৭। ই. উ. ফ্রী., পৃ. ৪
৮। ওই, পৃ. ৪
৯। ওই, পৃ. ৫
১০। ওই, পৃ. ৫
১১। রামগড় কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ—মার্চ ১৯৪০
১২। Muslims and India's Freedom Movement—B. K. Ahluwalia & S. Ahluwalia, 1985 Quoted in Political Ideas of Maulana Azad, Moni Shakir
১৩। ই. উ. ফ্রী, ৯৩
১৪। ওই

‘জ্বলন্ত প্রান্তর’-এর বৃত্তান্ত :

হুয়ান রুলফোর গল্প

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১ ভোরবেলায়

সান্ গাব্রিয়েল থেকে কুয়াশা বেরিয়ে এলো শিশির-ভেজা। রাতের মেঘেরা গাঁয়ের ওপর ঘুমিয়েছিলো লোকের গা থেকে ওম খুঁজে। এখন সূর্য প্রায় বেরিয়ে আসতে চলেছে আর কুয়াশা আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে, গুটিয়ে নিচ্ছে তার চাদর, রেখে যাচ্ছে ছাতের ফালি-ফালি শাদা। আর ভিজে মাটি থেকে এক ধূসর ভাপ, প্রায় চোখেই পড়ে না, উঠে আসছে গাছে, মেঘের টানে, কিন্তু সে পরক্ষণেই উধাও হ'য়ে যায়। তারপর রান্নাঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে কালো ধোঁয়া, পোড়া ওকের গন্ধ নিয়ে, আকাশকে ছাইয়ে ঢেকে দিয়ে।

দূরে পাহাড়গুলো এখনও ছায়ার মধ্যে।

একটা সোয়ালো ছোঁ দিয়ে নামে রাস্তায়, তারপরেই ভোরবেলার প্রথম ঘণ্টা বেজে ওঠে।

আলোগুলো নিভিয়ে দেয়া হয়। তারপর একটা মাটিরঙা ছোপ কাফনের মতো ঢাকে গ্রামকে, যেটা এখনও আরো-একটু নাক ডাকায়, দিন ফুটে-ওঠার রঙের মধ্যে ঢোলে।

দু-পাশে ডুমুরগাছ, হিকিলপান রাস্তা ধ'রে চ'লে আসে বুড়ো এস্তেবান একটা গোরুর পিঠে চ'ড়ে, তাড়িয়ে নিয়ে আসে তার দুধেল গাইগুলো। সে যে গোরুর পিঠে চ'ড়ে আসে তার কারণ ফড়িংরা তাতে তার মুখে এসে তিড়িংতিড়িং ক'রে লাফায় না। টুপি দিয়ে সে ভয় দেখিয়ে তাড়ায় মশার পাল আর মাঝে-মাঝে তার ফোগলা মুখে শিশ দেবার চেষ্টা করে গাইগুলোকে লক্ষ্য ক'রে, যাতে তারা পেছিয়ে না-পড়ে। জাবর কাটতে-কাটতে তারা দুলকি চালে এগোয়, ঘাসের শিশির ছিটকে তোলে গায়ে, আলো হ'য়ে আসছে। সে শুনতে পায় সান্ গাব্রিয়েলের দিন-ফোটার ঘণ্টা, আর গোরুটা থেকে নেমে পড়ে, হাঁটু মুড়ে বসে মাটিতে, তার দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে দিয়ে ক্রুশের চিহ্ন বানায়। গাছের কোটর থেকে একটা প্যাঁচা ডেকে ওঠে, তারপর এস্তেবান আবার লাফিয়ে উঠে পড়ে গোরুর পিঠে, গা থেকে জামা খুলে নেয় যাতে হাওয়া চাবকে হঠিয়ে দিতে পারে তার ভয়, আর ফের চলতে শুরু করে।

‘এক, দুই···দশ,’ শহরের মুখে গোরুপাহারা পেরিয়ে যাবার সময় সে গোনে। একটার কান পাকড়ে ধরে সে, তার মুখটা টেনে ঘুরিয়ে বলে, ‘এখন ওরা তোর বাছুরটাকে নিয়ে যাবে, ওরে হাঁদা! ইচ্ছে করে তো এইভাবেই চল, তবে আজকেই তুই তোর বাছুরকে শেষবারের মতো দেখতে পাবি।’ গোরুটি শান্ত চোখে তার দিকে তাকায়, ল্যাজের ঝাপট মারে তার গায়ে, তারপর এগিয়ে যায়।

তারা সকালবেলার শেষ ঘণ্টা বাজাচ্ছে এখন।

এটা জানা নেই সোয়ালোগুলো আসে কোথা থেকে—হিকিলপান না সান্ গাব্রিয়েল থেকে; তবে তারা ছোঁ দিয়ে নামে, এঁকেবেঁকে ঘোরে সামনে-পিছনে, বুকশুদ্ধু ডুবিয়ে দেয় কাদাজলে, উড়াল না-থামিয়েই; তারা কেউ-কেউ ঠোঁটে ক'রে টুকিটাকি ব'য়ে নিয়ে যায়, তারা কাদার গা ঘেঁষে যায় ল্যাজের ডগা দিয়ে কাদা ছুঁয়ে, তারপরেই সোঁ ক'রে উড়ে যায়, রাস্তা থেকে দূরে, উধাও হ'য়ে যায় কালো দিগন্তে।

মেঘেরা এখন পাহাড়ের ওপর, এত দূরে যে তাদের দেখে মনে হয় ঐ নীল টিলাগুলোর ঢালে যেন একেকটা ধূসর পলেস্তারার টুকরো।

বুড়ো এস্তেবান তাকিয়ে ত্যাখে রঙেরা বিসর্পিল ঝ'রে পড়ছে আকাশের মধ্যে—লাল, কমলা, হলুদ। তারারা শাদা হ'য়ে যাচ্ছে। শেষ ঝিকিমিকিটাও নিভে যায় আর সূর্য ফেটে পড়ে, ঘাসের ডগাগুলোকে চকচকে ক'রে দেয়।

‘বাইরে হাওয়ায় ছিলো ব'লে আমার খালি পেটটা ঠাণ্ডা ছিল, এখন জানি না কেন। আমি সময়মতোই পৌঁছেছিলাম খোঁয়াড়ের দুয়ারে—ওরা আমার জন্যে দোর খোলেনি। যে-পাথরটা তুলে নিয়ে দরজায় ঘা দিচ্ছিলাম সেটা ভেঙে গেলো, তবু কেউ বেরিয়ে এলো না। তারপর আমার মনে হ'লো হয়তো আমার মালিক দোন দুস্তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি গোরুদের কিছুই বলিনি অথবা কোনো ব্যাখ্যাই দিইনি তাদের: আমি সটকে পড়েছিলাম যাতে তারা আমায় দেখতে না-পায় কিংবা পিছু না নেয়। বেড়াটা কোনখানে নিচু হ'য়ে আছে খুঁজলাম, তারপর সেটা বেয়ে উঠে লাফিয়ে নামলাম অন্যপাশে বাছুরগুলোর মধ্যে। আর যেই খিল তুলে দরজা খুলে দেবো, দেখি আমার মালিক দোন দুস্তো চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে আসছেন, ছুকরি মার্গারিতা তাঁর বুকে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে—আর আমাকে দেখতে না-পেয়েই খোঁয়াড় পেরিয়ে তিনি চ'লে গেলেন। আমি দেয়ালের গায়ে লেপটে লুকিয়ে রইলাম, ঠিক জানি আমাকে উনি দেখতে পাননি। অন্তত তা-ই আমি ভেবেছিলাম।’

বুড়ো এস্তেবান এক-এক ক'রে গোরুগুলোকে ঢুকতে দিলে, তাদের দুধ দুইতে-দুইতে। শেষটার বেলায় দুধ দোয়া বাকি রইলো, সেই যার বাছুর নেই এখন, এখন যে একাই ষাটজনের মতো হাম্বা রব জুড়ে দিয়েছে, শেষটায় দয়ার বশে সে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিল।

‘আচ্ছা, শেষবারের মতো,’ সে তাকে বললে, ‘ভালো ক'রে দেখে নে তোর বাছুরকে, গাটা চাট, এমনভাবে শেষ দেখা দেখে নে যেন মরতে চলেছে। তোর তো আবার বাচ্চা হবে, অথচ এই বড়োটাকে নিয়ে এখনও তোর কত আদিখ্যেতা।’ আর, বাছুরটাকে: ‘এখনই যত পারিস মজা ক'রে নে, কারণ ও আর তোর নেই; তুই দেখতেই পাবি যে এই দুধ নতুন দুধ, নতুন জন্মাবে যে বাছুর তার জন্যে দুধ।’ আর সে বাছুরটাকে ক'ষে লাথি ঝাড়লে যখন দেখলে যে চারটে বাঁট ধ'রেই সে চুষছে। ‘তোর থোতা মুখ ভোঁতা ক'রে দেবো আমি, হতচ্ছাড়া বন্দুকের বাচ্চা!’

'আর আমি তার নাকটাই ভেঙে দিতাম, যদি-না মালিক দোন হুস্তো কোত্থেকে উদয় হ'য়ে আমাকে শান্ত করার জন্যে লাথি কষাতেন। আমায় এমন ঠ্যাঙালেন যে আমি পাথরের মধ্যে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ি আর-কি, হাড়গোড়গুলো সব যন্ত্রণায় মটমট করছে এমন ঠ্যাঙানি খেয়েছে। সেদিন সারা-দিন ধ'রে, আমার মনে আছে, আমি ভারি দুর্বল বোধ করেছিলাম, নড়তে-চড়তে পারছিলাম না—যা ফুলে গিয়েছিলো গা-হাত-পা আর কী ভীষণ ব্যথা করছিলো—এখনও ব্যথাটা আছে।

'তারপর কী হলো? জানতেই পাইনি। আর আমি তাঁর জন্যে কাজ করিনি। অন্য-কারু জন্যেও নয়, কারণ তিনি সেদিনই মারা গিয়েছিলেন। কী, তুমি জানতে না? ওরা আমার বাড়ি এসেছিলো আমাকে বলতে, আমি তখন খাটিয়ায় চিৎপাত প'ড়ে আছি, আর আমার বুড়ি পুলটিশ লাগিয়ে ভেজা কাপড় বোলাচ্ছে গায়ে। ওরা আমায় খবরটা দিতে এসেছিলো। আর বলেছিলো আমিই নাকি তাঁকে খুন করেছি। লোকে নাকি সে-কথাই বলাবলি করছে। হ'তেও পারে, তবে আমার কিছু মনে নেই। তোমার কি মনে হয় না কাউকে খুন করলে একটা-না-একটা বলবার মতো চিহ্ন থেকে যেতো? নিশ্চয়ই যেতো, বিশেষত সে যদি তোমার মালিক হ'তো। তবে ওরা যেহেতু আমাকে এই হাজতে রেখেছে তার মানে নিশ্চয়ই কিছু-একটা হবে। কিন্তু ছাখো, বাছুরটাকে আমি মারলাম আর মালিক আমার কাছে এলেন—এ-পর্যন্ত সবকিছুই খুব ভালো ক'রে মনে আছে, পরে সবকিছু কেমন যেন আবছা, ঝাপসা। আমার মনে হচ্ছিলো আমি যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর যখন আমার খাটিয়ায় আমি জেগে উঠলাম দেখি পাশে আমার বুড়ি আমায় যত্ন-আত্তি করছে—আমার সারা গায়ের জ্বালা আর ব্যথার জন্যে আমি যেন একটা বাচ্চা ছেলে হ'য়ে গিয়েছি, যেন আর এই ভাঙাচোরা বুড়ো মানুষ নই। আমি এমনকী বুড়িকে বলেছিলাম, "হয়েছে, এখন চুপ করো!" স্পষ্ট মনে পড়ে এই কথাই আমি তাকে বলেছিলাম; তা একটা লোককে খুন করলে আমার তা মনে থাকবে না কেন? অথচ, তবু, ওরা বলে আমি নাকি দোন হুস্তোকে খুন করেছি। তো, ওরা বলে আমি দোন হুস্তোকে খুন করেছি? কী, একটা পাথর দিয়ে, অ্যাঁ? তা, হবেও বা, কারণ ওরা যদি বলতো ছুরি মেরে খুন করেছি সেটা পাগলের প্রলাপ হ'তো, কারণ ছেলে-বেলার পর থেকে আমি কখনও সঙ্গে ছুরি নিয়ে বেরুইনি—আর আমি ছেলেমানুষ ছিলাম—সে এখন থেকে অনেক, অনেক, অ-নে-ক বছর আগে।'

হুস্তো ব্রাম্‌বিলা তার ভায়ী মার্গারিতাকে বিছানায় শোয়ালে, একটুও আওয়াজ যাতে না-হয় সে-সম্বন্ধে ভারি সজাগ। পাশের ঘরটাতেই তার বোন ঘুমোচ্ছে, আজ দু-বছর হ'লো পঙ্গু, নিশ্চল, একটা ছেঁড়া তোনার মতো শরীর, কিন্তু সারাক্ষণ জেগেই থাকে। সে শুধু ভোরবেলার দিকে একটু ঘুমোয়; তখন একেবারে মড়ার মতো ঘুমোয়।

সে জাগবে সূর্য বেরিয়ে এলে, এখন। যখন হুস্তো ব্রাম্‌বিলা মার্গারিতার ঘুমন্ত দেহ বিছানায় শুইয়ে দিলে, তখন তার বোন তার চোখ খুলতে শুরু করেছে। সে তার মেয়ের নিঃশ্বাস শুনতে পেলে, জিজ্ঞেস করলে: 'কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি, মার্গারিতা?' আর চ্যাঁচামেচি শুরু হবার আগে যা কিনা মার্গারিতাকেও জাগিয়ে দেবে, হুস্তো ব্রাম্‌বিলা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

তখন সকাল ছ-টা বাজে।

সে খোঁয়াড়ে এলো বুড়ো এস্তেবানের জন্যে দরজা খুলে দিতে। চিলেকোঠাতেও যাবার কথা সে ভেবে-ছিলো, বিছানাটা ঝেড়ে ঠিক ক'রে দেবে ব'লে, যেখানে সে আর মার্গারিতা রাতটা কাটিয়েছে। 'পাদ্রি যদি এটা মানতে দেয় তবে আমি ওকে বিয়ে করবো; কিন্তু আমি ঠিক জানি তাকে জিগেশ

করলেই সে একটা হুলুস্থুল বাঁধিয়ে বসবে। সে বলবে এ হ'লো অনাচার আর আমাদের দুজনকেই ধর্মচ্যুত ক'রে একঘরে ক'রে দেবে। বরং গোপনই থাকুক ব্যাপারটা।' এই কথাই সে ভাবছিলো যখন সে দেখতে পেলে বুড়ো এস্তেবান বাছুরটাকে নিয়ে ধস্তা-ধস্তি করছে, তার শক্ত হাতে বাছুরটার মুখ চেপে ধ'রে তার মাথায় লাথি কষাচ্ছে। মনে হ'লো বাছুরটার পিঠ এর মধ্যেই ভেঙে গিয়েছে, কারণ সে তার পা দাপাচ্ছে মাটিতে, অথচ কিছুতেই উঠতে পারছে না।

সে ছুটে গিয়ে বুড়োর ঘাড় ধ'রে তাকে পাথরের গায়ে ছুঁড়ে ফেললো, লাথি কষালো, চেঁচিয়ে এমন-সব কথা তাকে বলতে লাগলো সে নিজেই জানতো না এমন খিস্তি সে উচ্চারণ করতে পারে। তারপর তার মনে হ'লো নিজেই বুঝি অজ্ঞান হ'য়ে যাবে, আর খোঁয়াড়ের বাঁধানো শানে চিৎপাত মাথা ঠুকে প'ড়ে গেলো। ওঠবার চেষ্টা করলে সে একবার, আবারও প'ড়ে গেলো, আর তৃতীয় বারে সে প'ড়েই রইলো নিশ্চল। যখন সে চোখ খোলবার চেষ্টা করলে এক মস্ত কালো মেঘ ঢেকে দিলে তার দৃষ্টি। কোনো ব্যথা লাগছিলো না তার, শুধু একটা কালো জিনিস তার চিন্তাকে ঝাপসা ক'রে দিচ্ছে যতক্ষণ না অস্পষ্টতা হ'য়ে উঠলো চরম, পুরোপুরি।

বুড়ো এস্তেবান যখন উঠে পড়লো সূর্য তখন ওপরে উঠে এসেছে। সে টলতে-টলতে চললো, কাৎরাতে-কাৎরাতে। ওরা জানতেও পারেনি কেমন ক'রে দরজা খুলতে পেরেছিলো, কেমন ক'রে বেরিয়ে এসেছিলো রাস্তায়। ওরা জানতেও পারেনি কেমন ক'রে সে পৌঁছেছিলো বাড়ি, দু-চোখ আঁটো ক'রে বোজা, সারা রাস্তায় ফোঁটা-ফোঁটা রক্তের ছিটে ঢালতে-ঢালতে সে চলেছিলো। বাড়ি এসেই সে ধপ ক'রে শুয়ে পড়েছিল খাটিয়ায় আর ঘুমিয়ে পড়েছিলো আবার।

তখন নিশ্চয়ই বেলা এগারোটা হবে, মার্গারিতা খোঁয়াড়ে ঢুকলো হুস্তো ব্রাম্‌বিলার খোঁজে, কাঁদতে-কাঁদতে, কারণ তার মা বিস্তর গালাগাল ও বক্তৃতার পর বলেছে সে হ'লো গিয়ে বেশ্যা।

সে হুস্তো ব্রাম্‌বিলাকে দেখতে পেলে মৃত।

'তা, ওরা বলে আমি তাঁকে মেরেছি। হবেও বা। কিন্তু তিনিও রাগের চোটেও মরতে পারেন। বড্ড বদমেজাজি ছিলেন, রগচটা। সবকিছু তাঁর চোখে মন্দ ঠেকতো: খোঁয়াড়গুলো নোংরা, জলের জ্বালায় জল নেই, গোরুগুলো হাড়জিরজিরে। সব তাঁর মেজাজ বিগড়ে দিতো। আর আমি কেন হাড়-জিরজিরে হবো না যখন দু-বেলা খাওয়াই জোটে না। আমি তো সারা জীবনটাই তাঁর গোরু চরিয়ে কাটিয়েছি: তাদের হিকিলপান নিয়ে গেছি, সেখানে তিনি গোরু চরাবার মাঠ কিনেছিলেন; ওরা গোগ্রাসে পেটপুরে খাওয়া অব্দি অপেক্ষা করেছি, তারপর ভোর-ভোর আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। এ যেন এক অন্তহীন তীর্থযাত্রাই ছিলো।

'আর এখন ছাখো, কী হ'লো—ওরা আমায় হাজতে পুরেছে, আর আগামী হপ্তায় আমার বিচার করবে। কেন? না, আমি নাকি দোন হুস্তোকে খুন করেছি। আমার তা মনেই নেই—তবে তা হ'য়ে থাকতে পারে। হয়তো আমরা দুজনেই অন্ধ হ'য়ে গিয়ে ছিলাম আর বুঝতেই পারিনি যে পরস্পরকে খুন ক'রে ফেলছি। এও হ'তে পারে। স্মৃতি, আমার এই বয়সে, অদ্ভুত সব রঙ্গ করে; সেইজন্যেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমি খুব-কিছু-একটা হারাবো না যদি তারা আমার সব চেৎভেদই খতম ক'রে দেয়—কারণ সে-আমার কীই বা অবশিষ্ট আছে? আর আমার আত্মার কথা বলছো—তা সেও আমি ঈশ্বরকেই সমর্পণ ক'রে দেবো।'

সান্ গাব্রিয়েলের ওপর আবার কুয়াশা জড়ো হ'তে

শুরু করেছে। এখনও রোদ ঝলসাচ্ছে নীল পাহাড়-গুলোয়। একটা বাদামি ছোপ গ্রামটাকে ঢেকে দিলে। তারপর অন্ধকার এলো। সে-রাত্তিরে তারা আলো জ্বালায়নি আর, শোকে, কারণ আলো-গুলোরও মালিক ছিলেন দোন হুস্তো। ভোর না-হওয়া অব্দি কুকুররা সারারাত ডুকরে-ডুকরে উঠলো। চার্চের রং-করা কাচ ভোর অব্দি মোমের আলোয় আলো হ'য়ে উঠলো, আর তারা মৃতদেহ ঘিরে নিশি জাগলো। মেয়েরা অস্বাভাবিক রিনরিনে গলায় রাত্তিরের অর্ধেক স্বপ্নের ঘোরে গাইলো : 'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো যাতনাহত আত্মা'। আর চার্চের ঘণ্টা বাজলে সারা রাত, মৃতের উদ্দেশে, ভোর হওয়া অব্দি, যতক্ষণ-না দিন-ফোটার ঘণ্টা বেজে উঠে তাদের ঝমঝম আচমকা থামিয়ে দিলে।

২ মৃত্যুর পরে জন্মের আগে

একটা ছোটো উপন্যাস, একশো পাতায় শেষ, 'পেদ্রো পারামো' (১৯৫৫), আর তার দু-বছর আগে ছোটোগল্পের একটি সংকলন, তাও একশো কুড়ি পাতায় পনেরোটি গল্প, 'জলন্ত প্রান্তর' (১৯৫৩)—হুয়ান রুলফোর সমগ্র সৃষ্টিশীল রচনা শুধু এইটুকুই। পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে হুয়ান রুলফো, তারপর, আরেকটি উপন্যাস নিয়ে কাজ ক'রে চলেছেন, 'শৈলশিরা', কিন্তু আজও সে-বই বেরোয়নি।

কেন তবু মেহিকোর এই লেখককে লাতিন আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য লেখকেরা গুরু ব'লে মানেন, সেটা হয়তো আমাদের কৌতূহল উশকে দেবে। হুয়ান কার্লোস ওনেত্তি, কার্লোস ফুয়েন্তেস, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, মারিও ভার্গাস য়োসা—এমনি অনেক নাম পর পর মনে প'ড়ে যায় আমাদের, যাঁরা বই লিখে, অথবা কোনো প্রবন্ধে ঋণ স্বীকার করেছেন হুয়ান রুলফোর কাছে।

কেমন লেখেন হুয়ান রুলফো, তার একটা দৃষ্টান্ত দিয়েই এই নিবন্ধের সূচনা। ছোট্ট একটা গল্প 'ভোরবেলায়', সময়ের পরিসর মাত্রই চব্বিশ ঘণ্টা, এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয়, অথচ সময় কেমন ক'রে যেন অন্তহীন বেড়েই যেতে থাকে, পটভূমি হ'য়ে ওঠে ফাঁদ,—দারিদ্র্য, অজাচার, শোষণ, হিংস্রতা তৈরি ক'রে দেয় এমন-এক গোলকধাঁধা যা থেকে বেরুবার রাস্তাও কারুর ঠিকঠাক জানা নেই। স্মৃতি,—সে ধুরন্ধর, হাতসাফাই জানে, কী মনে রাখাবে কী মনে থাকতে দেবে না, সেটা তার মারাত্মক কৌশলে বুড়ো এস্তেবানকে পর্যন্ত দ্বিধায় সংশয়ে ঘুরপাক খাওয়ায়—সে জানে না, তার মনে নেই সে সত্যি তার মালিক হুস্তো ব্রামবিলাকে খুন করেছিলো কিনা। আর ঘটনা—সে যুগপৎ বহু বিভিন্ন স্তরে ঘ'টে চলে, একটার পাশাপাশি আরেকটা ঘটনা, একসঙ্গেই ঘটছে সব, আখ্যানের গতি মন্থর, প্রায় যেন থমকে থেমে যায় মাঝে মাঝে, আর এমন-একটা বোধ জাগিয়ে যায় আমাদের মধ্যে যেন আমরা কোনো এক স্থাণু, নিশ্চল, স্থাবর অনন্তের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। যাকে আমরা 'গল্প' বলি অজাচার, হিংসা, আঘাত সত্ত্বেও সেটা নগণ্য, প্রায় ধর্তব্যেই আসে না—শুধু 'চরিত্র' ফুটে ওঠে 'গল্পের' ওপর, লোকে কী করে তার চাইতেও বড়ো হ'য়ে ওঠে লোক নিজে, আর আছেন গ্রন্থকার, লেখক—যিনি সময়ের জোড় খুলে ফেলে তাকে থামিয়ে দিয়েছেন।

অথচ হুয়ান রুলফোর আখ্যান নাটকীয়তায় ভরপুর, রুদ্ধ-শ্বাস, তুলকালাম। কেমন ক'রে ফাঁদতে হয় কোনো আখ্যান, কেমন ক'রে ছোট্ট দু-একটা বাক্যে তৈরি ক'রে দিতে হয় চাল, আখ্যানের লয়, স্বরের টানাপোড়েন যা পাঠককে প্রথম থেকেই চুম্বকের মতো আটকে রাখবে, তা 'ভোরবেলায়' গল্পেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আমরা যে পরে গিয়ে পৌঁছুবো,—যদি কোনো স্থাণু জগতে কোথাও যাওয়াও যায়, বুড়ো এস্তে-বানের সেই ধূসর, আবছায়া স্মৃতির ভেতর,—সেটা কুয়াশা উঠি-উঠি ক'রেও ওঠে না যখন ভোরবেলায়, তখন একটা আলাদা অনুপুঙ্খ তৈরি ক'রে আমাদের সজাগ ক'রে রাখে। আবহাওয়ায় সবসত্ত্বেও কেমন-একটা তাড়া আছে যেন, যেন আছে চাপা আততি, অধিজ্যতা, কেমন একটা দ্বন্দ্ব। চার্চের ঘণ্টা বাজে, কুয়াশা সরাতে গিয়েও পারে না, গোরুর পিঠে ক'রে গাইগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে সারারাত জাগার পর আদ্ধেক ঘুমের ঘোরে বুড়ো এস্তেবান—সব কেমন একটা রহস্য, একটা কুহেলি, একটা অন্তর্ঘাতী ধ্বংসের আভাস নিয়ে আসে, আর চার্চে ঢং ঢং ক'রে বাজে প্রহর, তখনও। কেমন-একটা ছমছমে অনিশ্চয়তা আখ্যানটিকে অলুক্ষুণে আশঙ্কায় কাঁপিয়ে দিয়ে যায়।

যেমন এই গল্পে, তেমনি আরো কিছু গল্পেও, লেখক ছোট্ট কতগুলো বাহুল্যবিহীন চাঁছাছোলা বাক্যেই তৈরি ক'রে দেন প্রখর অন্তরঙ্গ নাটকীয়তা, গম্ভীর ধূসর রঙে, বাইরে থেকে প্রায় কোনো বর্ণনাই দেয়া হয় না চরিত্রের। জীবন দপদপ করছে, জীবন জঙ্গম, চলমান—অথচ আশ্চর্য দক্ষতায় হুয়ান রুলফো চরাচরকে থামিয়ে দেন, তৈরি ক'রে দেন নিশ্চলতার প্রতিভাস। এ-গল্পের বয়নের মধ্যে, আপাত-সরলতার আড়ালে, কতকিছুই যে আছে—সময় ফেটিয়ে, এদিক ওদিক ক'রে, অনুক্রম ভেঙে দিয়ে, দৃষ্টিকোণ সরিয়ে না-সরিয়ে, অতীতের ঝিলিক ফেলে, দ্বৈতালাপে বা নিজের সঙ্গেই আলাপে সূক্ষ্ম এক জটিল টানাপোড়েন তৈরি হ'য়ে যায়। আমরা জানিই না হাজতে ব'সে-ব'সে বুড়ো এস্তেবান অন্যকোনো কয়েদি বা জেলপাহারার সঙ্গে কথা বলছে কি না সে একা-একাই কথা সাজাচ্ছে, নিজেই বোঝবার জন্যে সত্যি কী হয়েছে, পুরোটাই তার নিজের সঙ্গে আলাপ। আর সবচেয়ে সেটা ভয়ংকর অনিশ্চয়—'ওরা বলে আমিই তাঁকে পাথর ঠুকে মেরেছি। জানি না। হ'তেও পারে। হবেও বা। মেরে থাকতেও পারি।' এই ধরনের কথার ভেতরকার চাপা বিদ্বেষ, আর নিজের অন্ধকার মানসের হিংস্রতার ইঙ্গিত—আরো একটি নাটকীয়তার আস্তর তৈরি ক'রে দেয়। আর এরই মধ্যে প্রায় নিরাসক্ত, গম্ভীর নির্বিকার শ্লেষ যোগ ক'রে দেয় অন্য-এক মাত্রা।

রুলফোর স্বগতোক্তি বা দ্বৈতালাপের মধ্যে একটা সহজ, অনায়াস, স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিমা আছে, মনেই হয় না যে কোথাও একটা প্রখর শিল্পিতার বোধ কাজ ক'রে যাচ্ছে। কাটা-কাটা, চাঁছাছোলা ভাষা, বাস্তব হ'তে গিয়ে কখনও ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে না, অথচ কবিতার বিদ্যুতে থরথর ক'রে ফুলকি ছিটোচ্ছে।

আর গ্রাম—মেহিকোর দুঃস্থ, দুর্গম, রুক্ষ, ঊষর গ্রাম তার মাটি পাথর, ধুলো, হাওয়া, কুয়াশা, চাঁদ, শকুন, করোটি হঠাৎ-বানভাসি-জল নিয়ে ফুটে ওঠে চাক্ষুষ, হ'য়ে ওঠে আখ্যানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, কোথাও আলাদা ক'রে বাইরে থেকে চাপানো কোনো বর্ণনা সে নয়—হয় সে বোঝাতে চায় কিসের ব্যঞ্জনা তিনি তৈরি করতে চাচ্ছেন, আর নয়তো এই গল্পের কুয়াশার পর্দার মতো হ'য়ে ওঠে আখ্যানেরই কেন্দ্রীয় চিত্রাভাস। আর ভিতর থেকে, গল্পের পর গল্পে, নিরন্তর খ'য়ে যাচ্ছে এই গ্রাম—নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, মেহিকোর ইণ্ডিয়ানদের নাছোড় অদৃষ্টবাদে ম্রিয়মাণ।

অথচ কী অদ্ভুত চাক্ষুষ ও সজীব এই গ্রাম, তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পটভূমি ; নগর থেকে তার অনতিক্রম্য দূরত্ব একই সঙ্গে আঞ্চলিক—কিন্তু তবু সারা মেহিকোরই অণুবিশ্ব। এত-সব দ্বৈতালাপ, স্বগতোক্তি, বহতা ভাবনা তার গল্পে, কিন্তু রুলফো কখনো আশ্রয় নেন না উপভাষায় বা আঞ্চলিক প্রকাশভঙ্গিতে, এমন-এক ভাষা তিনি তৈরি করেন যা স্থানীয়, ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে অকাট্যভাবে জড়ানো, আর স্বরের লয় ও অন্বয়ই তা তৈরি ক'রে দেয়—কোনো বিশেষ শব্দ বা অভিধানের শব্দসংগ্রহ নয়। সারাক্ষণ আছে নাম না-করা, চিনিয়ে না-দেয়া একদল 'ওরা'—নৈর্ব্যক্তিক একগাদা ব্যক্তির ভিড়, ব্যক্তিগত কোনো সম্বন্ধের পরপারে তাদের অবস্থান। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে যেন আঁৎকে, রেগে, বিবমিষায় 'ওরা' স'রে এসেছে। কিন্তু রুলফোর শ্লেষের তীক্ষ্ণতা এইখানেই যে তারাও এই একই জগতের অধিবাসী। 'মনে আছে' গল্পে যেমন কথক আরেকজন (বা অন্য অনেককেই) উর্বানো গোমেসের কাহিনী ব'লে যাচ্ছে, আর বারে-বারে বলছে 'ওরা' বলতো 'ওরা' করতো এইসব, এমন-এক ভঙ্গিতে, যেন এই বিশাল শনাক্ত না-করা সর্বনামের সে অংশ নয়—অথচ আমরা, অভিভূত, আবিষ্কার করি তার অবস্থানও এই 'ওরা'র বাইরে হ'তে পারতো না। নিজেকে এভাবে সরিয়ে-আনার, বিচ্ছিন্ন ক'রে দেবার চেষ্টাইও এই ঊষর গ্রামগুলোয় বেঁচে থাকবার চেষ্টার মতো পণ্ডশ্রম। কথকের এই দীর্ঘ, একটানা, কখনো-ঝুলে-না-পড়া অন্তর্বচন যতক্ষণ ধ'রে চলে, নিজের অজান্তেই যখন সে নিজের সম্বন্ধে এমন খুঁটিনাটি ব'লে দেয় যা থেকে বোঝা যায় সেও অন্যদের চেয়ে মোটেই আলাদা নয়, অথচ তবু ততক্ষণ ধ'রেই সে নিজেকে অন্যভাবে অন্যরকমভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা ক'রে যায়—কিন্তু তার কথা শেষ হ'তেই আমরা দেখতে পাই এক হ্যাচকা টানেই রুলফো তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন, শুধু তারই নয়, সমূহেরই মুখোশ। আর হালিস্কোর জলন্ত প্রান্তরে এই দুঃস্থ ইণ্ডিয়ানরা যখন কঠোর শারীরিক পরিশ্রম ক'রে বেঁচে-থাকার চেষ্টায় হন্যে হ'য়ে যায় তখন তাদের অন্তর্জগৎ ভরে যায় তীব্র মানসিক বিক্ষেপে, অনিবারণীয় আতঙ্কে, শোকে ও বেদনায় ও আক্ষেপে অন্তহীনভাবে জর্জর। তারা সবাই যেন ম'রে গিয়েছে, এখনও জন্মায়নি, জন্মের আগেই মৃত্যুর দ্বারা লাঞ্ছিত। অথচ তাদের নবজন্মের কথা ছিলো মেহিকোর অনেক বিপ্লবের অন্তত একটার পরে।

মনে আছে উর্বানো গোমেসকে, দোন উর্বানোর ছেলে, দিমাসের নাতি, সেই-যে লোকটা রাখালদের গান পরিচালনা করতো, আর যে মারা গিয়েছিলো 'গর্জন করে শাপভ্রষ্ট, হায়, সেই দেবদূত' আবৃত্তি করতে-করতে, সেবারকার ইনফ্লুয়েনজার মড়কে। সে অনেকদিন আগেকার কথা, পনেরো বছর হবে বোধ হয়। কিন্তু তাকে তোমার মনে-রাখা উচিত। মনে আছে আমরা তাকে বলতাম 'ঠাকুদ্দা' কারণ তার অন্য ছেলে ফিদেনসি ও গোমেসের ছিলো ছুটি ভারি দুরন্ত-চঞ্চল মেয়ে, একজন কালো আর বেঁটে, হীন একটা ডাকনাম দেয়া হয়েছিলো 'ঠাটিয়াল' আর অন্যজন ছিলো সত্যি দীঘল, তার ছিলো নীল চোখ—আর লোকে তো বলতো সে নাকি আদপেই তার নিজের মেয়ে ছিলো না—আর, তুমি যদি আরো বিশদ বর্ণনা চাও, তবে জেনে রেখো সে হেঁচকি রোগে ভুগতো। মনে আছে একবার সে কী হুলুস্থুল তুলে-ছিলো যখন আমরা খ্রীস্টযাগে গিয়েছিলাম আর ঠিক হেস্তুক্রিস্তোর উত্থানের মুহূর্তে হেঁচকি তাকে হামলা করলো—মনে হচ্ছিলো সে যেন একইসঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে—যতক্ষণ-না ওরা তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে চিনির পানা খাওয়ালো কিছুতেই আর হেঁচকি থামেনি। চিনির পানা খেয়েই সে শান্ত হয়ে-ছিলো। তার শেষ হ'লো লুসিও চিকোকে বিয়ে ক'রে, নদীর ধারের শুঁড়িখানাটার মালিক, এককালে যেটা ছিল লিব্রাদোর, ঐ যেখানে তেওদুলোসদের তিশির কলটা আছে।

মনে আছে ওরা তার মাকে বলতো 'বেগুন' কারণ সব সময়েই সে কোনো-না-কোনো ঝামেলা পাকিয়ে ব'সে থাকতো, প্রতিবারই শেষটায় সে এক বাচ্চা বিয়োতো। ওরা বলতো তার নাকি টাকাকড়িও ছিলো কিছু, কিন্তু সবটাই তার গচ্চা গেলো বাচ্চাগুলোকে কবর দিতে-দিতে, কারণ তার সব বাচ্চাই জন্মাবার কিছু পরেই ম'রে যেতো আর সে সবসময় তাদের জন্যে খ্রীস্টযাগে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করতো, গান গাইতে-গাইতে তাদের নিয়ে যেতো গোরস্থানে, আর ছেলেদের এক ধর্মসীতের দল গাইতো 'হোসানা' আর 'মহিমা' আর ঐ-যে গানটা 'প্রভু, তোমাকে পাঠালাম আজ আরেকটি শিশু-দেবদূত'। এইভাবেই সে গরিব হ'য়ে যায়—প্রতিবারেই সৎকারের সময় বিস্তর খরচ হ'তো তার, কারণ সে নিশিজাগরে অতিথিদের পানটান করিয়ে আপ্যায়ন করতো। তাদের মধ্যে শুধু ছুটোই বেঁচে গিয়েছিলো, উর্বানো আর নাতালিয়া, যারা জ'ন্মেই ছিলো গরিব, আর সে তাদের বড়ো হ'য়ে উঠতেও দ্যাখেনি, কারণ শেষবার বিয়োবার সময় সে টেঁশে যায়, তাছাড়া বয়েসও হচ্ছিলো তার, প্রায় পঞ্চাশ।

তুমি নিশ্চয়ই তাকে চিনতে, কারণ এমনিতে সে ছিলো হাড়কঞ্জুশ, সবসময়েই হাটে ফিরিউলিদের সঙ্গে তার ঝগড়া বেঁধে যেতো; যখন তারা টোম্যাটোর জন্যে তার কাছে চড়া দাম হাঁকতো, সে তুমুল শোর তুলে দিতো, বলতো তারা তাকে ঠকিয়ে ফাঁক করে দিচ্ছে। পরে, যখন সে গরিব হ'য়ে পড়েছে, তাকে তুমি দেখতে পেতে আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে, পেঁয়াজের টুকরো, সেদ্ধ বীন, কিংবা কোনো আখের টুকরো খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'তার বাচ্চাদের মুখ মিষ্টি করাবার জন্যে'। তার তো দুজন ছিলো, যেমন এই-যে তোমায় বললাম শুধু ঐ দুজনই কেমন ক'রে যেন টিঁকে গিয়েছিলো। পরে, তার কথা আর কিছুই জানা যায় না।

ঐ উর্বানো গোমেস ছিলো প্রায় আমাদের বয়েসী—হয়তো কয়েক মাস বড়ো হবে—পয়সা ছুঁড়ে জুয়ো খেলতে আর খেলায় জোচ্চুরি করতে মহাওস্তাদ। মনে আছে সে আমাদের লবঙ্গ বিক্রি করতো, আর আমরা তার কাছ থেকে কিনতামও, যদিও অনেক সহজ ছিলো পাহাড়ে গিয়ে নিজের হাতেই সেগুলো তুলে আনা। সে আমাদের কচি আম বিক্রি করতো, স্কুলের পাতিওর আমগাছ থেকে সে কাঁচা আম চুরি করতো, আর বিক্রি করতো বোঁটা-

সমেত কমলা যেগুলো সে স্কুলগেটে কিনতো দু-সেন্ট ক'রে আর আমাদের কাছে বেচতো পাঁচ সেন্টে। পকেটে যত জঞ্জাল ব'য়ে বেড়াতো সব সে নিলেমে চড়াতো—আগাতা গুলি, লাটিম, বেলুন, এমনকা সবজে আরশোলা সেই যেগুলোর পায়ে যদি সুতো বেঁধে দাও যাতে বেশিদূর উড়ে যেতে না-পারে আর ছটফট করে। আমাদের সব্বাইকার কাছ থেকে খাশা-খাশা সব জিনিস আদায় ক'রে নিতো, মনে আছে।

সে ছিলো নাচিতো রিভেরার শালা, ঐ যে-নাচিতো বিয়ের পরেই কেমন জবুথবু আধপাগলা গোছ হ'য়ে যায়, আর তার বৌ ইনেস সংসারের খাঁই-খরচা মেটাতে বড়ো রাস্তার ধারে ফলের রসের এক দোকান দিয়েছিলো, এদিকে নাচিতো সারাদিন কাটাতো দোন রেফুহিওর চুলছাঁটার দোকান থেকে ধার-ক'রে-আনা এক ম্যানডোলিনে বেস্থরো-সব গান বাজিয়ে।

আর আমরা উর্বানোর সঙ্গে যেতাম তার দিদিকে দেখতে, ফলের রস খেতে, সবসময় ধারে, ককখনো ধার শুধিনি আমরা, কারণ আমাদের কাছে তো কখনোই কোনো পয়সা থাকতো না। পরে উর্বানোর আর কোনো ইয়ারবন্ধু রইলো না, কারণ আমরা সবাই তাকে দেখতে পেলেই এধার-ওধার সটকে পড়তাম যাতে ধারের টাকা ফেরৎ চাইতে না-পারে।

কে জানে হয়তো সেইজন্যেই সে বদ হ'য়ে গিয়ে-ছিলো, কিংবা হয়তো জন্ম থেকেই বদ ছিলো।

পঞ্চম বছরের আগেই ওরা তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়, কারণ তার তুতো-বোন 'ঠাটিয়ালের' সঙ্গে হিশিথানার পেছনে একটা শুকনো খাতে ও বর-বৌ খেলছিলো। ওরা তার কান পাকড়ে হ্যাঁচকা টানে সদর দরজা দিয়ে নিয়ে আসে, ছেলেমেয়েরা সবাই একেকজনে ষাটজনের মতো হেসে ওঠে, তাকে নিয়ে-যাওয়া হয় ছেলেমেয়েদের সারের মধ্যে দিয়ে যাতে লজ্জায় তার মাথা কাটা যায়। আর সে মাথা উঁচু ক'রেই গিয়েছিলো, আমাদের সবাইকার দিকে ঘুষি পাকিয়ে, যেন বলতে চাচ্ছিলো: 'এর দাম তোমাদের কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হবে।'

আর তারপর মেয়েটাকে। 'ঠাটিয়াল' বেরিয়ে এসেছিলো শুকনো মুখ কুঁচকে, চোখ নামানো ছিলো ইটের মেঝেয়, তারপর দরজার কাছে এসেই সে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো, সে কী চেরাগলায় ডাক ছেড়ে কান্না, সারা বিকেল তুমি তা শুনতে পেতে, যেন কয়োটিরা ডুকরে কাঁদছে।

তবে তোমার স্মৃতি যদি খুব খারাপ হয় সেটা তোমার মনে পড়বে না।

ওরা দেখেছিলো তার খুড়ো ফিদেনসিও—ঐ যে তিশিকলে কাজ করতো—তাকে ধ'রে এমন ঠ্যাঙানি দিয়েছিলো যে আধমরাই ক'রে দিয়েছিলো, আর তাতে সে এমন খেপে গিয়েছিলো যে গাঁ ছেড়েই চ'লে গিয়েছিলো।

আমরা যা নিশ্চিত জানতাম তা হ'লো আমরা আশপাশে আর-কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না,—যতক্ষণ-না সে পুলিশ হ'য়ে ফিরে এলো। সবসময় সে বড়ো চত্বরটায় বেঞ্চিতে ব'সে থাকতো, দু-ঠ্যাঙের মাঝখানে বন্দুক, আর দুই চোখে জ্বলন্ত ঘৃণা নিয়ে সে আমাদের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকতো। অথচ তার দিকে যদি কেউ তাকাতো এমন তাকাতো এমন ভান করতো যেন সে তাকে চেনেই না।

এই সময়েই ও তার জামাইবাবুকে খুন করেছিলো, ঐ যে সারাদিন ধ'রে বেস্থরো তালে ম্যানডোলিন বাজাতো। নাচিতো ঠিক করেছিলো তার কাছে গিয়ে সেরেনাদ বাজাবে, তখন রাত হ'য়ে গিয়েছে, আটটার একটু পরেই হবে, তখনও ওরা আস্তার পাপমোচনের উদ্দেশে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজানো থামায়নি, তখন আচমকা সে কী চীৎকার আর্তনাদ, চার্চের লোকেরা তো বললে তাদের জপের মালাই নাকি ছিঁড়ে গিয়ে-ছিলো, আর ওরা দেখতে পেলে: নাচিতো প'ড়ে আছে চিৎপাত, ম্যানডোলিনটা দিয়ে মার আটকাবার চেষ্টা করছে, আর উঠানো তাকে তার মাউসারের বাঁট

দিয়ে কেবল মেরেই চলেছে। লোকে চেঁচিয়ে তাকে কী বলছে কিছুই যেন তার কানে ঢুকছে না—একটা খ্যাপা বুনো জানোয়ার, যেন পাগলা কুকুর। শেষটায় একজন—সে এমনকী এ-তল্লাটের লোকই ছিলো না—ভিড় ঠেলে এসে তার কাছে গিয়ে মাউসারটা কেড়ে নিয়ে পেল্লায় এক ঘা কষালে পিঠে, তাকে একেবারে বাগানের বেঞ্চিতে অজ্ঞান ক'রে ফেলে দিলে—আর সে প'ড়েই রইলো ওখানে, হাত-পা ছড়িয়ে।

ওরা তাকে ওখানেই রাতটা কাটাতে দিলে। যখন দিনের আলো ফুটলো, সে ওখান থেকে চ'লে গেলো। ওরা বলে প্রথমে সে গিয়েছিলো চার্চে, গিয়ে পুরুতের কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলো, কিন্তু পুরুৎ তাকে আশীর্বাদ করেননি।

ওরা তাকে গ্রেফতার করেছিলো রাস্তায়। খোঁড়াচ্ছিলো সে, যখন সে জিরিয়ে নেবার জন্যে একটু বসেছে, ওরা তার নাগাল ধ'রে ফেললে। সে কোনো বাধাই দেয়নি। ওরা বলে সে নিজেই দড়িটা জড়িয়েছিলো গলায়, এমনকী ওরা যাতে তাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে, কোন গাছ থেকে ভালো হবে, সেটাও সে নিজেই বেছে দিয়েছিলো।

তোমার নিশ্চই তাকে মনে আছে, কারণ স্কুলে আমরা একই ক্লাসে পড়তাম, আর আমি তাকে যতটা জানতাম তুমি তাকে ততটাই চিনতে।

৪ কে এই হুয়ান রুলফো? কী তাঁর পটভূমি?

হুয়ান রুলফো জন্মেছিলেন মেহিকোর হালিস্কোয়, ১৯১৮ সালে. তাঁর প্রথম ছোটোগল্প বেরিয়েছিলো চারের দশকে, মফস্বল গুয়াদালাহারার ছোটো পত্রিকায়। যখন তিনি শিশু, মেহিকোর অনেক বিপ্লবের একটিতে, রক্ষণশীলদের গুলিতে তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর কাকা তাঁকে মানুষ করেন কিছুদিন, তাঁর ঠাকুমা চেয়েছিলেন লোকে যাতে তাঁকে চিনতে না-পারে সেইজন্যে তাঁকে 'পেরেস' পদবি নিতে, যেটা অ্যাংলো-স্যাক্সনদের 'স্মিথেন' মতোই নামগোত্রহীন। হালিস্কো থেকে গোড়ায় গুয়াদালা হারায়, তারপর মেহিকো নগরীতে, রুলফো কিছুকাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সেটা মধ্যপথেই তাঁকে বাদ দিতে হয়। কিছুদিন নানাধরনের কায়িক শ্রমের কাজ করার পর তিনি একটি আপিশে কেরানির কাজ জুটিয়েছিলেন। পরে তিনি 'ন্যাশনাল ইন্‌ডিজেনিস্ট ইনস্টিটিউটের' সম্পাদকীয় দফতরে কাজ করেছিলেন, যেখানে ছেলেবেলার পর—এখন তাঁর চিন্তা অনেক পরিণত—ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়, তাদের জীবন আরো ভালো ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেন তিনি।

বিপ্লব মেহিকোয় সরকার পালটেছে, কিন্তু মানুষের অবস্থা পালটায়নি। সব অলংকারশোভিত প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত ফাঁকা আওয়াজেই পরিণত হয়েছে। কিন্তু হুয়ান রুলফো শুধু যে বিপ্লবী বাগাড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্যতাই ফোটাতে চাচ্ছিলেন তাঁর লেখায়, তা নয়—তিনি এমনকী নির্মোহ ও নিরাসক্তভাবে জনগোষ্ঠীর মুখোশও খুলে দিতে চাচ্ছিলেন। তারা যদি অংশ না নিতো, তবে এ-সব রক্তাক্ত বিপ্লব হাজার চেষ্টা ক'রেও জেনারেলরা সংগঠিত ও সংঘটিত করতে পারতো না।

মেহিকোর বিপ্লব নিয়ে অনেক আগেই লিখেছেন মারিয়ানো আসুয়েলা, তাঁর 'মাছিয়া' বা 'নিচের তলার যারা'। আগুস্তিন ইয়ানিয়েস লিখেছেন 'ঝড়ের কিনার'। কার্লোস ফুয়েন্তেস লিখেছেন 'আর্তেমিও ক্রুসের মৃত্যু' বা 'বুড়ো গ্রিঙ্গো' রোসারিও কাস্তেইয়ানোস তাঁর কাহিনীতে সেইসব বিক্ষুব্ধ দিনগুলিকেই ফুটিয়ে তুলেছেন, আর হোর্হে ইবারগুয়েনগোইতিয়া 'অগস্টের বজ্র' উপন্যাসে দমফাটা শ্লেষের কশা হেনেছেন এইসব বিপ্লবের বোলচাল, ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থানের মহড়াকে।

এই পটভূমিতেই আমাদের মনে রাখতে হবে 'পেদ্রো পারামো' ও 'জলন্ত প্রান্তর'-এর কথা। পেদ্রো পারামোতে সরাসরি পাঞ্চো ভিইয়ার অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের কথা আছে, কেননা সেটা ব্যর্থ হ'লো ইঙ্গিত আছে তারও। পেদ্রো পারামোর মতো কুলপতিরাই, প্যাট্রিয়ার্করাই, এইসব অভ্যুত্থান থেকে ফায়দা লুঠে নিয়েছিলো।

পেদ্রো পারামো কোমালার জমিদার। এই 'কোমালা' একটি কাল্পনিক জায়গা, যেমন কাল্পনিক হুয়ান কার্লোস ওনেত্তির সান্তা মারিয়া, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের মাকোন্দো, দেমেত্রিও আগিলেরা মাল্‌তার সান তোরন্তন, বা আরো আগে উইলিয়াম ফকনারের ইয়কনোপেটোফাওয়া কাউন্টি—কিন্তু ধীরে-ধীরে রুলফোর 'কামালা' হালিস্কোরই প্রতিচ্ছবি যদি না-হয় হ'য়ে ওঠে মৃত্যুর পরে জন্মের আগে কোনো-এক মধ্যবর্তী নারকীয় ভূগোলে প্রতিষ্ঠিত ঊষর, বন্ধ্যা, রুক্ষ, ভৌতিক পোড়োজমি। পেদ্রো পারামো ছলে-বলে কৌশলে জমি বাড়াতো, এই জমি বাড়াবার জন্যেই একদিন সে বিয়ে করেছিলো আখ্যানের আমি হুয়ান প্রেসিয়াদোর মাকে—কিন্তু তার মার সব জমিজমা কুক্ষিগত হবার পরেই ছেলে সমেত তাকে তাড়িয়ে দেয়। হুয়ান প্রেসিয়াদো তার মায়ের মৃত্যুশয্যায় কথা দিয়েছিলো একদিন সে কোমালা এসে পেদ্রো পারামোর মুখোমুখি হ'য়ে সব শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণার শোধ নেবে। কিন্তু সে কোমালা এসে ছাখে সে এক ভূতুড়ে শহর, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি, দিনের বেলায় কেউ নেই, রাত্তিরে জেগে ওঠে অশরীরী স্বর, মর্মরধ্বনি, ফিশফিশ, ছায়ামূর্তি, একটা বিদ্রোহী মড়াঘোড়া রাতের মাটি কাঁপিয়ে খ্যাপার মতে ছুটে যায় খটাখট, আর সে জানতে পায় পেদ্রো পারামোকে খুন করেছে তারই এক বৈমাত্রেয় ভাই এক জারজ ছেলে—যখন পেদ্রো পারামো ঠিক করেছিলো সারা গাঁকেই না-খাইয়ে মারবে। অনুসন্ধান শুরু হবার আগেই গল্প শেষ। কিন্তু কাহিনীর মাঝামাঝি এসে আমরা আবিষ্কার করি, কাহিনীর কথক, কাহিনীর উত্তম পুরুষ হুয়ান প্রেসিয়াদো—সেও কবেই মরে ভূত হ'য়ে গিয়েছে—এবং সে যাদের কাহিনীটা বলছে তারাও ভূত, অর্থাৎ আমরা। যদি অথবা ম'রে ভূতই না-হ'য়ে যেতাম, তাহ'লে মেহিকোর এই দশা, এই স্থাণু, স্থাবর ধ্বংসস্তূপকে আমরা সহ্য করতাম কী ক'রে?

প্রথমে হুয়ান রুলফো ভেবেছিলেন তাঁর আখ্যানের নাম দেবেন 'মর্মরধ্বনি'—যে অশরীরী ফিশফিশ শোনা যায় রাত্রে, তারই দিকে প্রথম থেকেই ইঙ্গিত দেবেন। কিন্তু পরে যে 'পেদ্রো পারামো' নাম দিয়েছিলেন, সেটা তাঁর সূক্ষ্ম, স্বনির্ভর, প্রত্যয়ী শিল্পিতারই পরিচয় দেয়। 'পেদ্রো'—মানে পিতা, খ্রীস্টীয় চার্চের প্রতিষ্ঠাতা পিটার, আবার তারই ধ্বনিগত সাদৃশ্যে 'পিয়েদ্রা' মানে পাথর—আর 'পারামো'—রুক্ষ, ঊষর, পোড়ো জমি অর্থাৎ যে-পিতা জন্ম দিয়েছে এই পোড়ো জমি। যে-বিপ্লব প্রতিশ্রুতি রাখেনি, মেহিকোকে পরিণত করেছে এইরকম এক আশ্বাসহীন ভবিষ্যৎবিহীন জন্মের আশাহীন এক নিশ্চল, বদ্ধ উদ্ধারহীন গোলকধাঁধায়।

আর 'জলন্ত প্রান্তর'ও তাই স্থাণু, যেখানে সময়ের জোড় খুলে গিয়েছে; ভোরবেলা সেখানে নতুন দিনের আশা জাগায় না—মৃত্যু হানে; মনে থাকে কেমন ক'রে গরিবরা জর্জর হ'য়ে থাকে দারিদ্র্যে, নিজেই যারা বেছে নেয় কোন্ গাছ থেকে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলবে।

হুয়ান রুলফো বিশ্বাস করেন অবস্থা যদি-না আমরা ভালো ক'রে বুঝতে পারি, তাহ'লে তাকে বদলাবো কী ক'রে—আর এই বোঝার চেষ্টায়, অনুধাবনের উৎকাঙ্ক্ষায়, তাঁর গল্পগুলো টান-টান হ'য়ে আছে।

হয়তো 'পেদ্রো পারামো'র সঙ্গে 'জলন্ত প্রান্তর'-এর গল্পগুলো পড়লে পাঠক নিজেই বুঝে নিতে পারবেন কেন লাতিন আমেরিকার এতজন লেখক তাঁকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছেন, কেন মাত্র দুটি ছোটো বই লিখেই রুলফো আজ লাতিন আমেরিকার সর্বাগ্রগণ্য লেখকদের একজন।

অবশ্য একটা পুনশ্চ আছে: রুলফো তাঁর নিজের পটভূমিকে বোঝবার জন্যে ১৯৭৩এ একটি বই লিখেছেন 'আউতোবিয়োগ্রাফিয়া আর্মাদা,' যেখানে তিনি স্মৃতিচারণের ছলে খুলে বলেছেন কেন তাঁর হালিস্কোকে না-জানলে (না-বুঝতে পারলে) সারা মেহিকোর জলন্ত সমস্যাগুলো বোঝা যাবে না। তাঁর প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় উপন্যাস 'শৈলশিরা' অবশ্য এখনও বেরোয়নি।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

১২৩

পাগলপন্থী এবং এ তিন আন্দোলনে ধর্মের প্রভাবের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তা হল, বিদ্রোহীদের এক বিশ্বাস যে, অসাধারণক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এমন এক সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেখানে "ন্যায় ও ধর্মে"র শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে থাকবে না কোনো অসাম্য বা এক শ্রেণীর উপর অন্য শ্রেণীর প্রভুত্ব। এ নূতন ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের কাছে পরিপূর্ণ সুখ আর সমৃদ্ধির প্রতীক, এবং এ নেতাকে তারা 'পরিত্রাতা' বলে মনে করেছে।[৩০২]

এ আন্দোলনগুলিতে বিশেষ করে প্রথম পর্যায়ে নেতার বিশিষ্ট ভূমিকার কথা বার-বার বলেছি। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আমূল রূপান্তরের জন্য কৃষকসমাজের অন্তর আকাঙ্ক্ষা থেকে নেতার আবির্ভাবকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না; কিন্তু আন্দোলনের মূল রূপটি এ আবির্ভাবের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত কৃষককুলের সম্মতিসাপেক্ষ নয়; বিদ্রোহীরা নেতাও নির্বাচন করে নি। এমন অবশ্যই নয় যে নেতা আর কারো সঙ্গে আন্দোলনের লক্ষ্য বা লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় সম্পর্কে কোনো আলোচনা করে নি। (কোনো-কোনো ক্ষেত্রে—যেমন ভগীরথ, বীরসা, শিবু ওরাওঁ—নেতারা আগেকার খণ্ড, বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্তও ছিল।) কিন্তু নেতার যে ঘোষণা বিদ্রোহের নূতন রূপলক্ষণ বিকাশের আরম্ভ বলা যেতে পারে, যা বিদ্রোহের মূল ধারাকে নির্ধারিত করেছে, তার ভিত্তি নেতার স্বতন্ত্র বোধ, উপলব্ধি। বিদ্রোহীদের কাছে নেতাও তাই অনন্যসাধারণ, দূরবর্তী, বিশিষ্ট। একক কোনো অস্তিত্ব; বিশিষ্টতার যে লক্ষণ তারা তার উপর আরোপ করে, তা তাই ধর্ম-লক্ষণাক্রান্ত।

এ ধরনের আন্দোলনের কোনো-কোনো ইতিহাস-কার বলেন শোষণমুক্ত, সাম্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সমাজব্যবস্থার কল্পনা এবং 'পরিত্রাতা' হিসেবে নেতার ধারণা প্রধানত খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবেই

গড়ে উঠেছে। Worsley মনে করেন পৃথিবীময় এ-ধারণা-প্রভাবিত আন্দোলনের বিস্তারে 'প্রধানতম' ভূমিকা খ্রীষ্টান মিশনারির।[৩০৩] তাঁর মতে, ভারতবর্ষে এ ধরনের 'একমাত্র উল্লেখযোগ্য' আন্দোলন ঘটেছে মুণ্ডা আর ওরাওঁদের ক্ষেত্রে; এর কারণ, মিশনারি-দের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। Hobsbawm-ও বলেছেন: 'ধরতে গেলে এ ধরনের আন্দোলন একমাত্র সেসব অঞ্চলেই দেখা গেছে, সেখানে ইহুদি-খ্রীষ্টান ধর্মের বাণী প্রচারিত হয়েছে।'[৩০৪]

এর কারণ হিসেবে বলা হয়, বাইবেলের কোনো-কোনো বাণী এ আন্দোলনের উপযুক্ত মানসিকতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল—যেমন, যিশুর আবির্ভাব ঘটেছে দুঃখতাপক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের পরিত্রাণের জন্য; যিশুর 'দ্বিতীয় আবির্ভাবে'র ফলে তাঁর অনুগামীরা পরবর্তী সহস্র বছর (millennium) সুখী এবং সমৃদ্ধ জীবন যাপন করবে।

ইহুদি-খ্রীষ্টীয় ধর্মচিন্তার এ প্রভাব আলোচনা-প্রসঙ্গে Hobsbawm বলেন: 'এটা খুবই স্বাভাবিক। যেসব ধর্মে বলা হয়েছে, পৃথিবী অবিরত পরিবর্তনশীল বা এখানে পরিবর্তনের ধারা চক্রবৎ আবর্তিত, বা পৃথিবী পরিবর্তনহীন এক বস্তু, সেগুলি এ বিশিষ্ট মানসিকতা এবং ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যে ধারণা এ ভাবাদর্শ গড়ে তোলে, তা হল এই যে, একদিন এ পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তারপর ঘটবে তার আমূল পুনর্বিন্যাস। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মে এ ধারণা নেই।'[৩০৫]

পাগলপন্থী এবং উপজাতিদের তিনটি আন্দোলনের আলোচনা থেকে এ সম্পর্কে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়। বাইবেলের বাণীর প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও এ ধরনের আন্দোলন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, যেখানে এ প্রভাব সুস্পষ্ট, সেখানেও তা শুধু এককভাবে কার্যকর হয় নি; আঞ্চলিক সংস্কৃতির নানা উপাদানের সঙ্গে তা মিশে গিয়েছিল। বস্তুত, এ মিশ্রণের প্রক্রিয়া অতি জটিল।

পাগলপন্থী আন্দোলনে "পরিত্রাতা" হিসেবে ধর্মগুরুর ধারণার মূলে বাইবেলের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই; তার ভিত্তি আঞ্চলিক পীরবাদের ঐতিহ্য।

সাঁওতাল আন্দোলনের উপর এক সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—সিধু-কানুর পুজোর বেদীর কাছে নিউ টেস্টামেনটের কয়েকটা ছেঁড়া পাতা বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল; আকাশ থেকে উড়ে আসা কাগজের যে টুকরোর কথা তারা বলেছিল, তা আসলে এ পাতাগুলো। এর তাৎপর্য সম্পর্কে এ প্রতিবেদনে কিছুই বলা হয় নি। সিধু-কানুর উপর বাইবেলের কোনো প্রভাব আদৌ ছিল কিনা, তা বলা শক্ত। ওই সময় এ অঞ্চলে মিশনারি প্রচার প্রায় নগণ্য বলা যায়। "সোসাইটি ফর দ্য প্রোপাগেশন অব দ্য গসপেল" ১৮২৬ সালে টি. ক্রিশ্চিয়ান বলে এক মিশনারিকে সেখানে পাঠায়। প্রচারের কাজ সম্ভবত বিশেষ কিছু হয় নি, কারণ মাত্র এক বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত অন্য কোনো চেষ্টাই হয় নি। ওই বছর চার্চ মিশনারি সোসাইটির উদ্যোগে E. Droese-কে সেখানে পাঠানো হয়। এ 'সোসাইটি'র 'সাঁওতাল মিশনে'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৬১ সালে।[৩০৬]

'হুলে'র সময় পর্যন্ত সাঁওতাল অঞ্চলে মিশনারি প্রচারের নগণ্যতা থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে সিধু-কানুর উপর বাইবেলের কোনো প্রভাব পড়ে নি। অন্য সূত্র থেকেও তা আসতে পারে। কোলদের মধ্যে গসনার লুথেরান মিশনের কাজ শুরু হয় ১৮৪৫ সালে। এটা অসম্ভব নয় যে কোল অঞ্চলে এসব প্রচারের কথা সাঁওতালরাও জানত। কোলদের সঙ্গে সাঁওতালদের যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল, তা হুলের সময় পরিষ্কার বোঝা গেছে।

কিন্তু সিধু-কানুর চিন্তা-ভাবনায় বাইবেলের প্রভাব সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ মেলে না। তাদের নিজেদের কোনো ঘোষণায় এর উল্লেখ নেই। খ্রীষ্টধর্ম খারওয়ার এবং পরবর্তী সাঁওতাল আন্দোলনকে

"নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত" করেছে, Catanach-এর এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত ভিত্তিহীন।[৩০৭]

মুণ্ডা-কোল অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সংগঠন ছিল অনেক বেশি ব্যাপক; মুণ্ডাদের 'জমিদার'-বিরোধী আন্দোলনে মিশনারিদের অবদানও অনস্বীকার্য। কিন্তু বীরসার প্রথম আন্দোলনের আগে পর্যন্ত নেতাকে 'পরিত্রাতা' হিসেবে কখনও ভাবা হয় নি। ডুবিয়া গোঁসাইকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মুণ্ডারা মনে করত। কিন্তু মুণ্ডা-অঞ্চলে তার নির্দেশে কোনো সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি।

বীরসার ধ্যানধারণায় বাইবেলের প্রভাব সুস্পষ্ট। মিশন স্কুলের ছাত্র হিসেবে বাইবেলের বাণীর সঙ্গে খ্রীষ্টান বীরসার পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ। তার ভগবানের ধারণা খ্রীষ্টানদের প্রেমময়, একান্ত অন্তরঙ্গ, নিবিড় ব্যক্তি সম্পর্কে সমৃদ্ধ ভগবানের ধারণা। বৈরী, অমঙ্গলময়, ভয়াল, দূরবর্তী কোনো দেবতার কল্পনার কোনো চিহ্নই এখানে নেই। অন্য সব দেবতা তো বটেই, এমনকী সিংবোংগারও কোনো উল্লেখ বীরসার 'প্রার্থনা-সংগীতে' নেই। 'প্রচারকে'র ভূমিকাও সম্ভবত 'মিশনারি'র আদলেই পরিকল্পিত। যিশুর মতো তারও প্রধান অনুগামীর সংখ্যা বারো। 'পরিত্রাতা' হিসেবে ধর্মগুরুর ধারণা নিঃসন্দেহে বাইবেলের 'সুসমাচার'-প্রভাবিত। বিপুল এক বিপর্যয়ে কোনো একদিন পৃথিবীর লয় হবে, আর তারপর হবে সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি—বীরসার প্রথম আন্দোলনের সময় এ প্রচারেও খ্রীষ্টীয় ধারণার প্রভাব অনস্বীকার্য।

'আদর্শ' পৃথিবী ও 'পরিত্রাতা'র ধারণায় বাইবেলের প্রভাব মেনে নিলেও এ প্রভাব কিভাবে বৃহত্তর মুণ্ডা-জগতে কার্যকর হতে পেরেছিল, ঐতিহাসিককে তার বিশ্লেষণ করতে হবে। ধর্মগুরুর মনে এ নূতন উন্মেষ যেন হাওয়ায়-উড়ে-আসা বীজের মতো; তার উৎস চিহ্নিত করা হয়তো কঠিন কাজ নয়; কিন্তু কী ভাবে ব্যক্তিগত এ উপলব্ধি বহুজনের চেতনায় সঞ্চারিত পল্লবিত হয়ে ওঠে, তার বিশ্লেষণ অনেক বেশি দুরূহ কাজ।

এ সঞ্চার সম্ভব হয়েছিল ধর্মগুরু-নেতার সচেতন প্রয়াসের ফলে। অনুগামীদের কাছে তার বোধের কথা পৌঁছিয়ে দেবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন এমন ভাষা, ধর্মীয় প্রতীক, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের উপর নেতা নির্ভর করেছে, যা তাদের কাছে সহজবোধ্য, এবং তাদের অনুপ্রাণিত করতে পারে। এ সবই তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের—তাদের লোকগাথা, কল্পপুরাণ, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইতিহাস চেতনার অঙ্গ। অর্থাৎ বাইবেলের বাণীর প্রভাব যেভাবে কার্যকর হতে পেরেছিল, তাকে মুণ্ডা-সংস্কৃতির নানা উপাদানের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এ নূতন বাণী মুণ্ডা-রাজ-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছিল বলে নেতার প্রচারেও এ দুটি প্রায় অভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আসলে এক পরম 'পরিত্রাতা'র আবির্ভাবের ধারণা মুণ্ডাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন ছিল না। সাঁওতাল আন্দোলনে এ ধারণার বিপুল প্রভাবের কথা তারা অবশ্যই জানত। নূতন পৃথিবীর সৃষ্টির লগ্নে মহাপ্লাবন, অগ্নিবৃষ্টি ইত্যাদি অদৃষ্টপূর্ব সংঘটনের ধারণাও তাদের একান্তই পরিচিত। বীরসার কাছে 'সত্যযুগ' ছিল আমূল রূপান্তরিত বিশ্ববিধানের প্রতীক। এটা মুণ্ডাদের পরিচিত ভাষা। যে নূতন বিধানের আসন্ন আবির্ভাব সম্পর্কে বীরসা (এবং যাত্রা ভগৎ ও শিবু ওরাওঁ) ঘোষণা করেছিল, তার সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক কোনো রূপ ছিল না; কিন্তু এ বিধানের যে রূপরেখার কথা বার-বার বলা হল, তাতে মুণ্ডারা সহজেই বুঝে নিল, এতে একান্তভাবেই তাদেরই অভীপ্সা প্রতিফলিত।

মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যসিদ্ধির একটা প্রধান উপায় হিসেবে মুণ্ডাদের সমৃদ্ধ ইতিহাসচেতনার উপর বীরসা বরাবর জোর দিয়েছে। বিশিষ্ট কোনো-কোনো প্রতীক ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল এ চেতনা সৃষ্টি করা।

বিশেষ কোনো প্রতীক মুণ্ডাদের বিশেষ কোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সে ঐতিহ্যের স্মৃতিকে জাগ্রত করে বীরসা তার অনুগামীদের শত্রু-বিরোধী চূড়ান্ত সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। মুণ্ডাজাতির এরকম এক মহান ঐতিহ্য ১৮৩১/৩২ সালের 'কোল বিদ্রোহ'। মুণ্ডা এবং ওরাওঁরা পরে পরম গর্বের সঙ্গে বার-বার তা স্মরণ করেছে। চরম পরাজয়ের গ্লানিবোধ তখন তাদের চেতনা থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মুণ্ডা সমাজে এবং অর্থনীতিতে এ বিদ্রোহ কী চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, তাও তারা ভুলে যায়। তারা শুধু মনে রেখেছে, দীর্ঘদিনের অধিকার রক্ষার জন্য এটা ছিল তাদের গৌরবময় সংগ্রাম। নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অমিত শৌর্য, দুর্বার সাহসের নানা কাহিনী তাদের লোকগাথার অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

বীরসা চেয়েছিল, মুণ্ডারা তাদের এ গৌরবময় ইতিহাস আবার স্মরণ করুক। তার সংগঠনের মূলকেন্দ্র কালকাদ থেকে সরিয়ে আনা হল কোলবিদ্রোহের একটা প্রধান কেন্দ্র ডোমবাড়িতে। এর একটা উদ্দেশ্য, ডোমবাড়ির ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ মুণ্ডাদের প্রেরণা যোগাবে।

যে প্রক্রিয়ায় বাইবেলের বাণী বিদ্রোহোন্মুখ মুণ্ডাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তা তাই অতি জটিল। তা ছাড়া সমাজ- ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য আসন্ন সংগ্রামের মানসিকতা সৃষ্টিতে এমন কিছু-কিছু প্রভাব কার্যকর ছিল, যার সঙ্গে বাইবেলের বাণীর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। ব্রিটিশ সামরিক পরাক্রম বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ফল—এ প্রত্যয় যে তাদের প্রতিরোধের সঙ্কল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, উপজাতিদের প্রতিটি আন্দোলনে আমরা দেখেছি। এ প্রত্যয়ের উৎস জাদুশক্তি, মন্ত্রশক্তি। শুধুমাত্র 'পরিত্রাতা'-ধর্মগুরুর অলৌকিক ক্ষমতায় এর সৃষ্টি নয়। এ শক্তিতে বিশ্বাস বিদ্রোহীদের প্রাক্তন ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ। এ শক্তি দৃশ্যমান নানা বস্তুতে মূর্ত হতে পারে—যেমন বীরদা (পুতবারি), যা বীরসা বিশেষ একটা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল। তা অদৃশ্য এবং বিমূর্তও থাকতে পারে—যেমন প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ এবং সমবেত সংগীত। মুণ্ডা, বিশেষ করে ওরাওঁ আন্দোলনে, জাদু-মন্ত্র-শক্তির এ প্রয়োগ বার-বার দেখা গেছে।[৩০৮] এ জাদুশক্তি কিভাবে শত্রুর পরাক্রমকে ব্যর্থ করে দেবে, তার কোনো ব্যাখ্যা আন্দোলনের নেতারা দেয়নি। কোথাও-কোথাও বলা হয়েছে, এ পরাক্রমের উৎসও এক ধরনের জাদুশক্তি; তাকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে সমধর্মী বিরুদ্ধ অন্য এক জাদুশক্তি।[৩০৯]

আসন্ন সংগ্রামের সামগ্রিক প্রস্তুতিতে 'ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার' আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে উপজাতিদের ক্রমবর্ধমান সচেতনতাও বাইবেলের বাণীর সঙ্গে সমৃদ্ধ নয়। তা অন্য এক সাংস্কৃতিক প্রভাব, প্রধানত ভ্রাম্যমাণ বৈষ্ণব গুরুদের প্রচারের ফল। এ আন্দোলনের ব্যাপকতম সংগঠন দেখতে পাই ওরাওঁদের ক্ষেত্রে।

১২.৪

সবশেষে, আমাদের নির্বাচিত আন্দোলনগুলিতে যে ধর্মচেতনার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আবার সংক্ষেপে নির্দেশ করতে চাই।

(ক) সমাজ-, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর-সাধনই যেখানে বিদ্রোহের মূল প্রেরণা, প্রধানত সেখানেই ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষণীয়। এ বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলেই দেখা গেছে। (খ) ধর্ম-চেতনার যে রূপ বিদ্রোহীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, তা বহুলাংশে উপজাতিদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস থেকে গুণগতভাবে স্বতন্ত্র। পুরনো ধর্মবিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে গড়ে উঠেছে। নূতন বিশ্বাসের প্রসার নূতন ধর্মগুরুর সচেতন প্রয়াসের ফল; এ বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ধর্মীয় গোষ্ঠী, যদিও সাংগঠনিক সংহতির চরিত্র সব ক্ষেত্রে সমান নয়। ধর্মগুরুর এ

প্রয়াসের ভূমিকা আদৌ সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয় নয়; তা মূলত রাজনৈতিক। (গ) উপজাতিদের একটা নূতন ধারণা ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। তা হল—পরাক্রান্ত শত্রুর সমকক্ষ হতে হলে তাদের নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতির আমূল পুনর্বিন্যাস অপরিহার্য; এর জন্য বহু ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, আচার, সামাজিক প্রথা নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে; বস্তুত, এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে নূতন জীবনচর্যা, নূতন নৈতিক এবং অধ্যাত্ম জীবন। (ঘ) নূতন এ অনুশাসনের ফলে উপজাতিদের পুরনো সামাজিক সংহতি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল হয়েছে, কারণ সবাই এ কঠোর নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয় নি; কিন্তু প্রখরতর হয়েছে স্বতন্ত্র উপজাতিসত্তার চেতনা। যেমন, টানা-ভগৎ-গোষ্ঠী-ভুক্ত ওরাওঁরা তাদের বহু জীর্ণ ঐতিহ্যকে 'টেনে' উপড়ে ফেলতে চেয়েছে; কিন্তু তাদের ধারণা ছিল, এর ফলে তারা ফিরে পাবে তাদের 'আদি' 'কুরুখ ধরম' (সত্য ধর্ম, আসল ধর্ম)। (ঙ) এ নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াসে অন্য ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব প্রায় অনিবার্য ছিল। কিন্তু উপজাতিরা সচেতনভাবে তার বিশেষ-বিশেষ অংশ বেছে নিয়েছে। হিন্দুধর্ম তাদের শুদ্ধির ধারণাকে প্রধানত প্রভাবিত করেছে (এ ধারণা তাদের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়); কিন্তু হিন্দু-সমাজ সংগঠনের বিশিষ্ট কোনো-কোনো দিক (যেমন, বর্ণ-জাতি-প্রথা) তারা মোটেই গ্রহণ করে নি। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে উপজাতিদের ধর্মবিশ্বাসে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন আসে নি। মুণ্ডা-ওরাওঁ অঞ্চলে কোনো-কোনো সময়ে খ্রীষ্টান হওয়ার হিড়িককে লোকে ব্যঙ্গ করে 'চুল-কাটার আন্দোলন' বলত। চার্চের সঙ্গে এদের আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। বীরসার আন্দোলন যখন শুরু হয়, সে নিজেকে খ্রীষ্টান হিসেবে পরিচয়ই দিত না। কিন্তু খ্রীষ্টের বাণী থেকে মুণ্ডারা সে অংশই বেছে নিয়েছে, যা তাদের বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

যে ধর্ম বিদ্রোহী কৃষকদের প্রভাবিত করেছে, তা তাই কোনো অনড় কাঠামো নয়; কয়েকটা সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস আর আচারের সমাহার নয়। সন্ধান করেছে তারা নূতন বিশ্বাসের; বেরিয়ে আসতে চেয়েছে জীর্ণ ঐতিহ্যের অচলায়তন থেকে; আবার কোনো-কোনো পুরনো বিশ্বাস, প্রায়-বিস্মৃত যৌথ সামাজিক আচার নূতনতাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এ নিরন্তর আত্মানুসন্ধান প্রবল শত্রুকুলের সঙ্গে সম্পর্কের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য তাদের প্রয়াসের একটা বিশিষ্ট দিক। এমন কোনো সমাজদর্শনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না, যার সাহায্যে তারা এ সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের বিকল্প উপায় ভাবতে পারত।

সমাপ্ত

তথ্যনির্দেশ :

৩০২. খ্রীষ্টান মিশনকে উনি বলেছেন : 'the greatest single agency for the world-wide spreading of millenarianism'. *The Trumpet Shall Blow ; A Study of the Cargo Cults in Melanesia* (London, 1957), p 245.

৩০৩. E. J. Hobsbawm, *Primitive Rebels* (New York, 1959), pp 57-58.

৩০৪. সাঁওতাল অঞ্চলে মিশনারি প্রচার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে : Tripti Chaudhuri, *Some Aspects of English Protestant Missionary Activities in Bengal, 1857-1885*, (unpublished B. Litt. thesis, University of Oxford, 1968), Ch. IV. 'Activities of Missionaries among the Santals'.

৩০৫. I. J. Catanach 'Agrarian Disturbances in Nineteeuth Century India', *Indian Economic & Social History Review*, Vol. II, Issue No. I., March 1966, p 77.

৩০৬. বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, জাদু-মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসের আদি রূপ বিদ্রোহের সময় আমূল পালটে গেছে। জার্মানি-অধিকৃত Tanzania-তে Maji-Maji আন্দোলনকে

(১৯০৫) দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। আন্দোলনের শুরুতে নেতা শুধুমাত্র বলেছিল, এমন এক ঔষধের কথা সে জেনেছে, যার ব্যবহারে চাষীদের চাষবাস সম্পর্কিত সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে; ফসল হবে নিশ্চিত; তাই জার্মানরাজ-প্রবর্তিত তুলোর চাষে তাদের দিনমজুরি করতে হবে না। বস্তুত, এ ধরনের বিশ্বাস আগেও ছিল। জার্মানরাজ-বিরোধী বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করলে maji'র; প্রয়োগ শুধুমাত্র কৃষি-কাজের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকল না; বিদ্রোহীরা বিশ্বাস করল, এর ফলে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় থাকবে। G. C. K. Gwassa and John Iliffe (ed.) *Records of the Maji Maji Uprising* (East African Publishing House, Nairobi 1967) পাঁচটি নির্বাচিত আন্দোলনে জাদুশক্তি ও মন্ত্রশক্তির মূর্ত ও বিমূর্ত রূপের সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। Michael Adas তাঁর *Prophets of Rebellion ; Millenarian Protest Movements against European Colonial Order* (The University of North Carolina Press, 1979) : ch. 6 : "Mobilization : Symbol and Ritual, Talisman and Sympathetic Magic". ফিলিপাইন কৃষক আন্দোলনে বাইবেলের প্রভাব কিভাবে লৌকিক সংস্কৃতির নানা দিকের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল, তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন R. C. Ileto, *Pasyon and Revolution : Popular Movements in the Philippines, 1840-1910* (Atenco de Manila University Press, Quezon City, Metro Manila, 1979), pp 28-35. Anting-Anting নামক এক বিশেষ ক্ষমতা (যা একধরনের রক্ষা-কবচেও মূর্ত হত) অর্জন করার উপায় সম্পর্কে ধারণা এমন এক লোকায়ত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে বাইবেলের প্রচারের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

৩০৭. M. Adas, পূর্বোল্লেখিত।

এই সংখ্যায় মুদ্রিত
আবুল কালাম আজাদের চিন্তাধারা সম্পর্কিত নিবন্ধে
আজাদের পিতার নামের বানানে ভুল আছে। সঠিক বানান :
খয়রুদ্দিন

তৃপ্তি মিত্র : দেখেছি একটি প্রতিভার স্ফুরণ

খালেদ চৌধুরী

প্রতিভা এমন একটি শব্দ, সাধারণ লোকে যা ব্যবহার করে খুব অসতর্কভাবে। শব্দটির গূঢ় অর্থ না বুঝে অনেক সময় যে-কোনো সামান্য কিছু ক্ষমতাসম্পন্ন লোককেই সাধারণভাবে প্রতিভাবান বলা হয়। কিন্তু যথার্থ অর্থে প্রতিভা বোধহয় জন্মায় খুব কম। মানুষের মধ্যে কিছু অধীত বিদ্যা অনেক সময় থাকে, যার কিছু জন্মগত, কিছু চর্চালব্ধ। এসবের বাইরে কিছু মানুষ হন ব্যতিক্রম। তৃপ্তি মিত্র তেমনই এক ব্যতিক্রম, সত্যিকার অর্থেই যাকে প্রতিভা বলা যায়।

আমি তাঁকে প্রথম চিনতে পারি বোধহয় ১৯৪৪-এ। তখন আমি প্রথম কলকাতায় আসি। আই. পি. টি. এ.-এর (ভারতীয় গণনাট্য সংঘের) তখন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সে সময় মহম্মদ আলি পার্কে একটি সম্মেলন হয়। প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ এবং গণনাট্য সংঘের। আমি সেখানে এসেছিলাম গান গাইতে। সেখানেই প্রথম "নবান্ন" দেখি। তার আগে এ নাটকটি সম্পর্কে শুনেছিলাম। বাঙলার দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে শুনেছিলাম। বস্তুত, আমি যখন আসামের কাছাড়ে থাকতাম, সেখানে দুর্ভিক্ষের কোনো ছায়া ছিল না। "নবান্ন" নাটকের মধ্যে দিয়ে তাই এক নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি হলাম।

তখনকার গণনাট্য সংঘের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এই পার্টির বিভিন্ন স্তরের লোকজন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

"নবান্ন" নাটক আজকের বিচারে হয়তো দেখবেন তেমন কিছু নয়। তবু আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না—এ দেশের নাট্য-আন্দোলনের ধারায় "নবান্ন" একদিন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কেননা "নবান্ন"-র বিষয়বস্তুটা ছিল সমকালীন। এবং তার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কিছু চরিত্র ছিল যে চরিত্রগুলি আগে কখনো স্টেজে ওঠে নি। কাপড়-চোপড় নেই, না-খেতে-পাওয়া মানুষ, তারাই ছিল এ-নাটকের নায়ক। সেখানে তৃপ্তি মিত্র একটি চরিত্রে অভিনয় করলেন। সেখানে আরো অনেকেই ছিলেন। যেমন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য; শম্ভু মিত্র ছিলেন। তিনি আবার কো-ডিরেক্টারও। এবং সুধী প্রধান। তিনি একটা বড়ো রোলে অভিনয় করতেন। তা ছাড়া, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শোভা সেন, মণিকুন্তলা সেন। তৃপ্তি মিত্র সেখানে নিরঞ্জন বলে একটি চরিত্রের ছোটো বউয়ের পার্ট করতেন। ভালো অভিনয়ের জন্য এসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম তখন মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯৪৫-এ পাকাপাকিভাবে আসাম থেকে আমি কলকাতায় চলে এলাম। তখন আমি গোয়াবাগানে থাকতাম। আই. পি. টি. এ.-র একটা কমিউন ছিল। সেখানে সুধী প্রধান এবং অন্যান্যরা থাকতেন। সে সময় শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র—এঁরা সব বোম্বেতে খাজা আহমেদ আব্বাসের "ধরতি কা লাল" ছবিতে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন। তারপর ওঁরা ফিরে এলেন। সে সময় মাঝে-মাঝে আমি তৃপ্তি মিত্রকে দেখতাম। সে দেখা শুধু দেখা। জানলাম ইনিই তৃপ্তি মিত্র। তখনও তিনি অবশ্য তৃপ্তি ভাদুড়ী। খুবই সাদাসিধে, আনঅ্যাট্রাক্‌টিভ যাকে বলা যায়। অভিনেত্রী বলতে যে গ্ল্যামার-ট্র্যামার থাকে, ওই-সমস্ত কোনো কিছুই ছিল না। বরং এখনো চোখের সামনে সেই প্রথম দিকের দেখার যে

ছবি ভেসে ওঠে, সেটা হচ্ছে, যুদ্ধের সময় এক ধরনের শাড়ি বিক্রি হত, সেটাকে কনট্রোলের শাড়ি বলা হত, আট টাকা দামের সেই শাড়ি পরে তিনি ওখানে যেতেন। বোধহয় আশুতোষ কলেজে পড়তেন। সেই সঙ্গে এ. আর. পি.-তে একটা পার্ট-টাইম চাকরি করতেন। এসব আমার শোনা কথা। যেহেতু আমার চরিত্রের মধ্যে একটা গোলমাল আছে—কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহলটা আমার চিরকালই কম। তাই আমি হয়তো ব্যক্তি-মানুষ তৃপ্তি মিত্রর বর্ণনা নিখুঁতভাবে দিতে পারব না। পরবর্তী কালে বছরের পর বছর তাঁর সঙ্গে মিশতে-মিশতে কথাপ্রসঙ্গে হয়তো তিনি নিজের প্রসঙ্গে কোনো কিছু বলেছেন, সেটা কখনো মনে থেকেছে, কখনো থাকে নি।

আসলে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আই. পি. টি. এ.-র একজন কৃতী অভিনেত্রী হিসেবে। কাজেই আমি তাঁকে দেখব সেদিক থেকে। আমার বিচার্য বিষয় সেটা।

গোয়াবাগানের সেই আস্তানায় আই. পি. টি. এ.-র বিভিন্ন স্কোয়াডের বিভিন্ন শাখার রিহার্সাল হত। তিনি ছিলেন নাটকের শাখায়। আমি প্রথমটা ছিলাম গানের শাখায়। তারপর যখন আস্তে-আস্তে আমার গলাটা খারাপ হতে লাগল, তখন ব্যালের দিকে গেলাম। তা ছাড়া আঁকা-জোকার দিকটা তো ছিলই। কাজেই যেহেতু নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না, সেজন্য তৃপ্তি মিত্রর সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে আসা সে সময় সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য ইচ্ছে না থাকলেও একবার নাটকের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম, সে গল্পটা বলি।

১৯৪৫-এর শেষের দিক। মেদিনীপুরে "নবান্ন" নাটকের বোধহয় শেষ অভিনয়। আগেই বলেছি, অভিনয় আমার নেশাও নয়, পেশাও নয়। আমার ওটা লাইনও নয়, ঠিক বুঝিও না। কিন্তু তখন একটা ব্যাপার ছিল : আই. পি. টি. এ.-তে যে-কোনো লোককে লাগিয়ে দেওয়া হত। সে সময় "নবান্ন"-তে রবীন্দ্র মজুমদার চরণ নামে একটি চরিত্র করতেন। হঠাৎ কোনো কারণে তাঁর মেদিনীপুর যাওয়া সম্ভব হল না। আমাকে বললেন চরিত্রটা করে দিয়ে এসো। ছোট্ট পার্ট। পাখিপড়া করে আমাকে মুখস্থ করিয়ে দিলেন। সেভাবে গিয়ে অভিনয় করে আসলাম। খুবই অশোভনভাবে। সে নাটকে তৃপ্তি মিত্র বা শম্ভু মিত্র ছিলেন কিনা একেবারে মনে নেই।

এরপর আবার একটা নাটক। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা"। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র সবাই ছিলেন। আমি আংশিকভাবে যুক্ত ছিলাম। তৃপ্তি মিত্র সে নাটকে ছিলেন কিনা আমি মনে করতে পারছি না। এটাই বোধহয় আই. পি. টি. এ.-র তরফ থেকে শেষ অভিনয়। তারপর আই. পি. টি. এ.-র মধ্যে একটা ভাঙন আসে। ওদিকে দাঙ্গা লেগে গেছে। গ্রুপের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে। মতপার্থক্য দেখা দিচ্ছে। যাই হোক, এই পর্বে আমি তৃপ্তি মিত্রদের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে আসি নি।

দেশ স্বাধীন হল। ১৯৪৭-এর শেষ দিকে একদিন জর্জদা—দেবব্রত বিশ্বাসের বাড়ি গেছি। আই. পি. টি. এ.-এর গানের জন্য মাঝে-মাঝেই আগে জর্জদার বাড়িতে রিহার্সাল হত। সেখানে সেদিন দেখলাম শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র দুজনেই আছেন। আলাপ হল। আসলে সে সময় আই. পি. টি. এ.-র সঙ্গে যুক্ত থাকলেই একটা একাত্মবোধের অনুভূতি আমরা অনুভব করতাম। সেদিক দিয়ে খুব কাছের লোক বলে সকলকে ভাবতাম।

তারপর আই. পি. টি. এ.-র ব্যালে স্কোয়াডের সঙ্গে আমি আসাম চলে গেলাম। ফিরে আসার পর সরে এলাম আই. পি. টি. এ. থেকে।

তখন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র বাসা বেঁধেছেন ১১ নাসিরুদ্দিন রোডে। যেহেতু পরিচয় ছিল, মাঝে-মাঝে পথেঘাটে দেখা হত। কুশলজিজ্ঞাসা হত। তাঁরাও তখন আই পি. টি. এ. থেকে সরে এসেছেন। সে সময় মেহের আলি রোডে আমি থাকতাম। ওখানে বেকবাগানে আমাদের একটা আড্ডা ছিল। মাঝে-মাঝে আসাযাওয়ার পথে ওঁদের বাড়ি যেতাম। দেখা-সাক্ষাৎ হত। চা খেতাম। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এরকম চলত। আমি তখন ওয়েস্টার্ন মিউজিক-এ ডুবে আছি। এই যে দেখা-সাক্ষাতের কথা বললাম, তা ছিল একেবারে ফর্মাল, সৌজন্যমূলক।

এরপর বোধহয় ১৯৫৩-য় শম্ভু মিত্র বহুরূপী করেছেন। মাঝে-মধ্যে আমাকে দিয়ে ছুয়েকটা পোস্টার বানিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁরা তখন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ফেসটিভ্যাল করছিলেন—"পথিক", "উলুখাগড়া" আর "ছেঁড়া তার" নিয়ে। আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন।

শম্ভু মিত্র তখন মাঝে-মাঝে আমার বাড়িতে আসতেন। কথাবার্তা বলতেন। নাটক সম্পর্কে আমি আগ্রহী কিনা জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন বললেন, 'মন্মথ রায়ের "ধর্মঘট" নাটকটা করছি। তুমি একটু মিউজিক দেখিয়ে দাও। আর সেটের ব্যাপারেও একটু সাহায্য করো।'

আমি তো নাটকের ব্যাপারে কিছুই বুঝি না। গানের ব্যাপারে না হয় সাহায্য করলাম, সেট আর কী বুঝব? ওঁরা নিজেরাই কী-সব দাঁড় করালেন। আমি বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে!' বস্তুত এই "ধর্মঘট" নাটকের মধ্য দিয়েই প্রথম আমি বহুরূপীর সংস্পর্শে এসেছি। এভাবে ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগটা দৃঢ় হল। সে সময় ওঁদের মেয়ে হয়ে গেছে। শাঁওলি। ছোট্টখাট্টো তখন।

তার বছরখানেক পরে ১৯৫৪-য় "রক্তকরবী" শুরু হওয়ার সূত্রে ওঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি পেল। এ নাটকের মঞ্চপরিকল্পনাই শুধু নয়, দৃশ্য ও পরিচ্ছদ-পরিকল্পনা, সঙ্গীত ও আবহ-সৃষ্টির দায়িত্বও ছিল আমার ওপর। সেই "রক্তকরবী"তে নন্দিনীর ভূমিকায় সচেতনভাবে অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রকে আমি উপলব্ধি করলাম। তার আগে "ধর্মঘট"-এ দেখেছি। দাগ কাটার মতো তেমন কিছু মনে হয় নি। যেমন "নবান্ন"-তে যে অভিনয়, সবাই এত নাম করেছে। যেহেতু সবাই নাম করেছে, সুতরাং নিশ্চয়ই নামী। রেখাপাত করার মতো অভিনয় তখনো কিন্তু মনে হয় নি। অবশ্য এমনটাও হতে পারে, "রক্তকরবী"র আগে নাটক সম্পর্কে আমার আগ্রহ ততটা গড়ে ওঠে নি। অতটা খুঁটিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখার অভ্যেসটা তখন ছিল না।

এই হল প্রথম সূত্রপাত। প্রতিটি দিন আমি বসে-বসে রিহার্সাল দেখতাম। সেখানে অভিনেত্রী হিসেবে তাঁর গড়ে-ওঠা দেখলাম। একটা প্রতিভার উন্মেষ চোখের সামনে দেখলাম। আস্তে-আস্তে গড়ে উঠছিলেন তিনি। এ এক মহৎ অভিজ্ঞতা। ঠিক যেন কুঁড়ি থেকে একটি ফুল ফোটার মাঝখানের সেই রহস্যময় প্রক্রিয়া। দিনের পর দিন রিহার্সাল। প্রতি মুহূর্তে একটা রূপান্তর। একটা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছানো। যাকে পারফেকশন বলা যায়।

সে সময় এদেশের মঞ্চে "রক্তকরবী" একটা যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। এত আধুনিক। প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকেই আমাদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। প্রচণ্ড বিরুদ্ধতাও এসেছিল। অনেক বিখ্যাত লোক সমালোচনা করেছিলেন। বিশ্বভারতী থেকেও আপত্তি এসেছিল। কারণ তাঁদের কাছে রিপোর্ট গেছল, এটার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। গানের ব্যবহার নিয়েও অনেক সমালোচনা হয়েছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অন্নদাশংকর রায় আমাদের উপদেশ দিলেন, 'আপনারা শান্তিনিকেতনে

যান। যদিও শান্তিনিকেতনে "রক্তকরবী" আগে কখনো হয় নি, তবু সেখানে পুরোনো যাঁরা আছেন, তাঁরা তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাটা কী ছিল, এটা আপনারা বেশ জানতে পারবেন। আপনারা নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।'

শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমরা নন্দলালবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি যা-যা কথা বলেছিলেন, যেভাবে রক্তকরবীর ব্যাখ্যা করেছিলেন, দেখলাম, আমাদের চিন্তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য ছিল না। আসলে একটা কথা বলা বোধহয় ভালো, "রক্তকরবী" প্রযোজনার সময় আমার ভূমিকায় আমি ঠিক করেছি, কি বেঠিক করেছি, সে-ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না আমার। জিনিসটা এসে পড়েছে, হয়ে গেছে। স্টেজ-এর কোনো অভিজ্ঞতা আম'র ছিল না। ব্যাপারটা ঘটে গেছে, এটুকুই আজ বলতে পারি।

নন্দিনীর শাড়ির রঙ নিয়ে আমার সমস্যা ছিল। ধানি রঙের কথা ছিল। তা সেটা কাঁচা ধান হবে, না, পাকা ধান। নন্দলালবাবু বললেন, 'কাঁচা ধান হবে।'

আমি শুধালাম, 'কাঁচা ধান হলে পাড়ের রঙটা কী হবে? লালটা মেলাতে পারছি না। কারণ লালটা দিলে আবার কালো দেওয়া যায় না।'

উনি যেটা করে দিলেন, পাড়ের মধ্যে দুদিকটা কালো মাঝখানটা লাল। সবুজের সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেল। পরবর্তী কালে লালটাকে বাদ দিয়ে বোধহয় হলুদ করে দিয়েছিলাম। কেননা রক্তকরবীর ফুলের রঙটা ছিল লাল। চারপাশের লালের মাঝখানে পাড়ের ওই লালটা ম্লান হয়ে যায়।

তারপর নন্দবাবু বললেন, 'তোমরা কিঙ্করের সঙ্গে দেখা করো।'

রামকিঙ্কর বেইজ। তাঁর কাছে আমরা গেলাম। তাঁর ঘরে ঘণ্টা দু-তিন আলোচনা হল। শুরুতে আমি ছিলাম না। চা করতে গেছলাম। কিঙ্করদার রান্নাঘরের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। ততক্ষণে শম্ভু মিত্র ও অমর গাঙ্গুলি কথা বলছিলেন।

চা তৈরি করে ফিরে আসার পর আমাদের আলোচনায় যেটা প্রধান প্রশ্ন ছিল, নাটকের মাঝখানে যদি বারবার গান আসে, নাটকের গতি ব্যাহত হয়ে যায়। তখন কী করা যাবে?

কিঙ্করদা বললেন, এক লাইনের বেশি গাইবে না। তারপর ছেড়ে দেবে। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু গান দিয়েছেন, সেজন্য গান একেবারে বাদ দিলে সবাই আপত্তি করবে। কিন্তু ভুললে চলবে না, রবীন্দ্রনাথের একটা ব্যক্তিত্বের ব্যাপার ছিল। সেজন্য চলে যেত। কিন্তু আমরা নিজেরা করলে দেখেছি, গান যতই ভালো গাওয়া হোক না কেন, নাটকের গতিকে ব্যাহত করে। কাজেই কেটে দেবে। এক লাইন গান গেয়ে কেটে দেবে।

কিঙ্করদার কথাতে আমরা মনের জোর পেলাম।

সে-সময় একটা বিতর্ক উঠেছিল, বহুরূপীর আগে 'রক্তকরবী' শান্তিনিকেতনে হয়েছে কি হয় নি।

কিঙ্করদা বললেন, হয় নি। তবে একবার রিহার্সাল হয়েছিল। আমি শুরু করেছিলাম। শান্তিদেব ঘোষ বিশু আর রানু (রানু কি রানী কিঙ্করদা কী বলেছিলেন এখন মনে নেই) করেছিল নন্দিনী। এ সময় খবর রটে গেল, আমরা "রক্তকরবী"র রিহার্সাল দিচ্ছি। গুরুদেব এলেন। বললেন, 'কিঙ্কর, তোমরা নাকি রিহার্সাল দিচ্ছ! এটা তো আমি পড়ার জন্য করেছি, এটা কি অভিনয় হবে? আচ্ছা, দেখি, কী করছ তোমরা!' উনি দিন-তিনেক রিহার্সাল দেখলেন। তারপর বললেন, 'এ নন্দিনী

আমার নন্দিনী নয়। আমার নন্দিনীর মধ্যে যেমন উচ্ছলতা আছে, তেমনি গাম্ভীর্য আছে। এ নন্দিনীর মধ্যে উচ্ছলতা আছে, কিন্তু গাম্ভীর্য নেই।' এই বললেন, তারপর কী হল, হয় দেশের বাইরে চলে গেলেন, কিংবা দেশের কোন্ কাজে জড়িয়ে পড়লেন, জানি না, কোনো কারণে তিনিও আসেন নি, আমাদেরও রিহার্সাল বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই এটা আর কোনোদিন শান্তিনিকেতনে হয় নি।

কিঙ্করদার কথার খেই ধরে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তৃপ্তি মিত্রর নন্দিনীর মধ্যে কিন্তু এই সমন্বয়টা দেখতে পেলাম। যেমন উচ্ছলতা, তেমনি গভীরতা। তখন অনেক বিদ্বজ্জন মন্তব্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আশীর্বাদ করতেন এই অভিনেত্রীকে। তাঁদের মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এরকমভাবেই ভাবনা করতেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁদের মনে হয়েছিল ঈশানীপাড়ার নন্দিনী এরকম হওয়া দরকার। তৃপ্তি মিত্র সেই নন্দিনীকে রূপ দিতে পেরেছিলেন। আমার কাছে মনে হয়, এভাবেই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। যাকে আমার কাছে কখনো significant কিছু মনে হয় নি, হঠাৎ মনে হল ভীষণভাবে significant। এই তাঁর জয়যাত্রা শুরু হল।

মজার ব্যাপার হল, "পথিক", "উলুখাগড়া", "চার অধ্যায়" আর "ছেঁড়া তার"-এ তৃপ্তি মিত্রর অভিনয় আমি "রক্তকরবী"-র পরে দেখেছি। "পথিক"-এ সুমিত্রার ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নতুনভাবে ভালো লাগল। "উলুখাগড়া"-র করুণা—সেটা একটা হিসটেরিক্যাল চরিত্র—বদমেজাজি মহিলা। সেটা আমি পরে দেখেছি। তারপর দেখলাম "চার অধ্যায়"। এলা। ভীষণ রোমানটিক চরিত্র। অন্য রকমের চরিত্র। এবং দুজনের সঙ্গে অভিনয় দেখলাম দু-রকম। সবিতাব্রত যখন অন্ত করতেন, তখন তৃপ্তি মিত্র যে অভিনয় করতেন, একটু বাড়াবাড়ি মনে হত। শম্ভু মিত্রকে তখন আমি বলেই ছিলাম, কোথাও একটু বাড়াবাড়ি লাগছে। আবার শম্ভু মিত্র যখন অন্ত করলেন, তখন কিন্তু সেই বাড়াবাড়িটা মনে হল না। ভীষণ সংযত মনে হল, এটা বোধহয় চরিত্রের জন্য হয়তো। অন্তর চরিত্রে দুজনে কেমন অভিনয় করলেন, সেটা বলতে পারব না, তবু মনে হল ব্যালান্স হল এটা। এবং সেখানে আর-এক ধরনের অভিনয় দেখলাম।

তারপর দেখলাম "ছেঁড়া তার"। ফুলজানের চরিত্র। একটা মুসলমান গ্রামীণ মেয়ে। তাঁর পক্ষে যেটা সুবিধা ছিল, তিনি উত্তরবঙ্গের মেয়ে। নাটকটার ডায়ালগ ছিল উত্তরবঙ্গের ভাষায়। এই তৃপ্তি মিত্রকে যখন নন্দিনীর প্রেক্ষাপটে এইসব নানাধরনের চরিত্রে অভিনয় পর-পর দেখতে থাকলাম, তখন তাঁর ভার্সাটিলিটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। প্রতিভার স্ফুরণের একটা প্রসেস আমি যেন উপলব্ধি করলাম। ফুলফোটার প্রক্রিয়ার মতো। ধাপে-ধাপে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যিনি পারফেকশনে পৌঁছাচ্ছেন।

"রক্তকরবী"র পর ইবসেনের "ডল্‌স্ হাউস"—"পুতুলখেলা"। মঞ্চসজ্জায় নতুন ধরনের পরিকল্পনা করা হল। অদ্ভুত এক নারীচরিত্রে অভিনয় করলেন তিনি।

তবে আমার কাছে "রক্তকরবী"র পরে তাঁর সবথেকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় মনে হয়েছে "রাজা"। আমি ওঁদের "ইডিপাস" স্টেজে দেখি নি। তবু আরো অনেক অভিনয় তো দেখেছি। কিন্তু "রাজা"তে মনে হয়েছে, একটা চূড়ান্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। যেখানে ওঁর অভিনয়ের মধ্যে একটা স্পিরিচুয়াল কোয়ালিটি প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ উনি যে-কোনো ক্রিয়েটিভ আর্টের একটা মহৎ সীমানা স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।

এটাই হচ্ছে প্রতিভা, যার কথা আমি শুরুতেই বলছিলাম। এমন বহুমাত্রিক অভিনয় আমি আমার জীবনে আর দেখি নি। কোথায় ওঁর কৃতিত্ব সেটাও বলছি। ওঁর কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। যেমন চেহারার সীমাবদ্ধতা। কারণ সাধারণত লোকে আশা করে, একজন অভিনেত্রী সুন্দরী হবে। সেই অর্থে তিনি সুন্দরী ছিলেন না। গ্ল্যামার ছিল না। তবে ফিগার খুব ভালো ছিল। আর-একটা সীমাবদ্ধতা ছিল—তাঁর গলার স্বর। আমি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে বলতে শুনেছি। কোন্ নাটক মনে নেই। প্রথম দিকের কথা। কোনো একটা চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রকে দিয়ে অভিনয় করাচ্ছিলেন। রিহার্সালে বসেছিলাম। তখন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বললেন, 'তোমরা সব বোনই তো কোকিলকণ্ঠী। ঠিক আছে, করো দেখি, কী আর করা যাবে।' অর্থাৎ ওঁদের সব বোনেরই গলার আওয়াজটা একটু শ্রিল।

কিন্তু মহিলা এমন অসাধ্য সাধন করলেন! সেই সীমাবদ্ধতা চর্চার দ্বারা এমন একটা স্তরে নিয়ে গেলেন যে সেই গলায় কতরকমের আওয়াজ খেলত, তার ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। সেটার চূড়ান্ত পরিচয় দেখেছি "রাজা"তে। ঈডিপাসে তিনি কিছু গলার ব্যবহার করেছিলেন রানী ইয়োকাস্তার ভূমিকায়। তাতে চরিত্রের যে ব্যাখ্যা উনি দিয়েছিলেন—এরকম একটা পাপ কাজ হয়েছে নিজের অজান্তে, এবং সেখানে উনি ঈডিপাসকে টেনে নিয়ে আসছেন, বলছেন—চলে এসো, দেখতে চেয়ো না, জানতে চেয়ো না সন্তানরা কারা—বাস্তবকে জানতে চেয়ো না। একটা হিসটেরিক্যাল ক্যারাকটার। এখানে যে গলাটা উনি বার করেছেন, সেদিন টিভিতে দেখলাম, তাতে মনে হল, এই যে বিভিন্ন চরিত্রে আলাদা হয়ে যাওয়া, এ একটা অদ্ভুত ক্ষমতা।

আর-একটা বড়ো গুণের কথা বলি। অনেক বড়ো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে আমি দেখেছি, অভিনয় করতে-করতে এমন একাত্ম হয়ে যেতেন যে নিজেরাই চোখের জলে নাকের জলে হয়ে যেতেন। আমি নিজেও গান গাইতে গিয়ে দেখেছি। গণনাট্য সংঘের দুঃখের গান গাইছি, চোখ দিয়ে জল পড়ছে। লোকের কিছু হচ্ছে না। তৃপ্তি মিত্রকে কিন্তু কখনো চোখের জল ফেলতে দেখি নি। অথচ গলার আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গে লোকে কাঁদছে। একটা ঘটনা মনে পড়ছে। দিল্লীতে বোধহয় "ছেঁড়া তার" হচ্ছিল। লঙ্গরখানায় রহিমুদ্দির স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে এক বন্ধু এসে রহিমুদ্দিকে চিঁড়ে খাইয়ে গেছে। তারপর মেয়ে এসে বলল, আমাকে খেতে দেয় নাই। লঙ্গরখানায় খেতে দেয় নি। রহিমুদ্দি তখন মাথা ঠুকে বলছে, চিঁড়ে খেলাম, না, বিষ খেলাম। আমাকে বিষ এনে দে। বাচ্চাটা খায় নি। অথচ নিজে খেলাম। এই যে একটা দৃশ্য—এখানে বাবা এবং মেয়ে। পাঁচ-ছ বছরের শাঁওলি তখন বাচ্চার রোল করছে। বাবা শম্ভু মিত্র। দুজনেই কিন্তু একেবারে আউট। এটা আমার মনে আছে। আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। শাঁওলি তো ওই যে শুরু করল, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে প্রায় সমস্ত রাত কেঁদেছে। শম্ভু মিত্রও পুরো involved। কিন্তু তৃপ্তি মিত্র দেখলাম একেবারে স্টেডি। মানে অভিনয় করে যাচ্ছেন, কিন্তু কোথাও একফোঁটা চোখের জল পড়ছে না। এই কনট্রোলটা তাঁর অভিনয়ের একটা বড়ো দিক। একটা ডিট্যাচমেন্ট তাঁর মধ্যে থাকত। একটা নিরাসক্তি, যেখান থেকে তিনি তার উর্ধ্বে ওঠার প্রচণ্ড ক্ষমতা রাখতেন।

অভিনয় ছাড়াও তাঁর আরো কিছু গুণ পরবর্তী কালে প্রকাশ পেল। ভালো গল্প লিখলেন। নাটক লিখলেন। প্রবন্ধ লিখলেন। নাটক পরিচালনা করলেন। তাঁর প্রতিভার অন্যান্য দিক আস্তে-আস্তে খুলতে লাগল।

উনি প্রথম নাটক পরিচালনা করলেন বোধহয় "ডাকঘর"। বহুরূপীর একাধিক পরিচালনা করেছেন—"যদি আর একবার", "কিংবদন্তী" ইত্যাদি। তারপর "অপরাজিতা"। নিজেরই ভাবনাচিন্তা দিয়ে নীতীশ সেনকে দিয়ে লেখালেন। একা করে গেলেন আঠারোটা চরিত্র। সেখানে তাঁর অভিনয় একটা অবিস্মরণীয় ব্যাপার। এটা যারা দেখেছে, তারাই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারবে। ওঁর শেষ অভিনয় ১৯৮৭-র ২৫ অকটোবর। সেদিন ছিল ওঁর জন্মদিন।

শেষ দিকে একটা স্কুল করেছিলেন। "আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়"। সেখানেও "রক্তকরবী" আবার করেছিলেন। আমি তো ইতিমধ্যে নাটক ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি তখন অসুস্থ। আমার কাছে গিয়ে নতুনভাবে "রক্তকরবী" করার পরিকল্পনার কথা বললেন। তাঁর নাটকের ওই স্কুলের উপযোগী একটা সেট করে দিলাম। ছেলেমেয়েরা বগলে করে যাতে জিনিসপত্র নিয়ে যেতে পারে, ঠিক সেরকম।

নতুন ছেলেমেয়েদের তৈরি করছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ে। করলেন "দুরাশা"। আসামের ভবেন সইকিয়ার একটা গল্প নিয়ে করলেন। তারপর অভিনয় করলেন বিধায়ক ভট্টাচার্যর "সরীসৃপ"। বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর জন্যই নাটকটা লিখেছিলেন, যাতে উনি অভিনয় করতে পারেন। মনমোহন থিয়েটার ভেঙে যাচ্ছে, তার ওপর নাটকটা। সেটা আপনারা দেখেছেন দূরদর্শনেও। ওরা রেকর্ড করে রেখেছে।

সালটা ১৯৫৭ কিংবা ১৯৫৮ হবে, ঠিক মনে করতে পারছি না, আমি তো ঠিক গবেষক নই, বোধহয় উনি তখন বাংলাদেশে যাচ্ছিলেন। সেরকম সময়ে উনি একটি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেন। সে আত্মজীবনীর উৎস বা প্রেরণা কিন্তু বিনোদিনীর আত্মকথা। "রূপমঞ্চ" নামে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন ছিল, ওতে ধারাবাহিক বেরোচ্ছিল। পরবর্তী কালে সৌমিত্র আর নির্মাল্যরা ওটা বের করে। সেটা বহু পরে। যেটা বলছিলাম, সেই সময় তৃপ্তি মিত্র কয়েক সংখ্যা "রূপমঞ্চ" পড়েছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, 'আপনি ওটা পড়ে দেখবেন। ভীষণ সুন্দর।'

তখন মাত্র কয়েকটা কিস্তি বেরিয়েছিল। তার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উনি নিজে একটা আত্ম-জীবনী লিখতে শুরু করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জীবনটা নানারকমভাবে সংঘাতময়। প্রায় তিরিশ-চল্লিশ পাতা নিজের লেখা আত্মজীবনী আমাকে সে সময় পড়ে শুনিয়েছিলেন। লেখার তখন খুব একটা ধার ছিল না। কেমন যেন ঝাপছাড়া লাগছিল। তেমন যেন জুত হচ্ছিল না। খানিকটা পড়ে নিজেই বললেন, 'তাহলে এখন থাক। বুঝতে পারছি, কী রকম যেন কাঁচা লেখা।' আমার যেন মনে হয়, লেখার সূত্রপাত বোধহয় সে সময়েই হয়েছিল। তার আগে কিছু লিখেছিলেন কিনা জানতাম না।

পরবর্তী কালে দেখলাম, শিবতোষ ভাদুড়ী ছদ্মনামে এবং স্বনামেও বেশ কিছু বলিষ্ঠ নাটক লিখলেন। "বলি", "ইঁদুর", "সুতরাং—এই তিনটি বিখ্যাত নাটক তো আছেই। সর্বশেষ নাটক "প্রহর-শেষে"। জলপাইগুড়ির যে বন্যা হয়েছিল, সেটাকে ভিত্তি করে অদ্ভুত একটা ট্র্যাজেডি। বুড়োবুড়ির কাহিনী। ইচ্ছে ছিল নিজে করবেন। কিন্তু নিজে করে যেতে পারেন নি। হিন্দি নাট্য সংস্থা "অনামিকা"-কে দিয়ে করিয়েছিলেন। 'সাঁঝ ঢলে' নামে হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন ড. প্রতিভা আগরওয়াল।

অনেকগুলো অসাধারণ গল্প লিখেছেন। মিত্র ঘোষ থেকে "এই পৃথিবী রঙ্গালয়" নামে একটা গল্পসংকলন বেরিয়েছে। তাতে দেখা গেল, তার গল্প লেখার হাত বেশ ভালো। আর প্রবন্ধ তো ইতস্তত প্রায় লিখতেন।

তৃপ্তি মিত্রর সঙ্গে এতকালের পরিচয়। কত কথা আজ মনে পড়ছে। অনেক কষ্টে মারা গেলেন। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অসুখে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এ মৃত্যু হয়তো এক দিক দিয়ে তাঁর কাছে মুক্তি। কিন্তু দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল প্রচণ্ডভাবে। এরকম একটা প্রতিভার জন্য দেশে বহু যুগ ধরে অপেক্ষা করে থাকে।

"চতুরঙ্গে"র প্রতিনিধি কামাল হোসেনের কাছে কথিত।

প্রসঙ্গ তৃপ্তি মিত্র

সুনীল সেন

তৃপ্তি মিত্রের স্মৃতি মনে গেঁথে আছে। তাই, আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এই লেখা পাঠাচ্ছি।

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁওয়ে (অধুনা বাংলাদেশের অন্তরভুক্ত) তৃপ্তি মিত্রের জন্ম। সামাজিক দিক থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ঠাকুরগাঁও শহরে বাস করলেও তৃপ্তি মিত্র উন্নত প্রগতিশীল পরিবেশে বড়ো হয়েছিলেন। তাঁর মা (আমাদের মাসিমা) সেকালের সম্ভবত শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বোন। তাঁর দিদির স্বামী কবি অরুণ মিত্র। ঠাকুরগাঁওয়ের জননেতা হাজী মহম্মদ দানেশের প্রভাবে তৃপ্তি মিত্রের মা কৃষকসভার সঙ্গে যুক্ত হন ; তাঁদের বাড়ি ছিল আমার আশ্রয়। তেভাগা আন্দোলনের সময় গভীর রাত্রে 'মাসিমা' বলে ডাক দিলেই ঠাকুরগাঁও শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত এই বাড়ির দরজা খুলে যেত। মাসিমা আমাকে স্নেহ করতেন বলে তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সত্তরের দশকে শম্ভু মিত্র আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার ফলে তৃপ্তির খোঁজখবর তাঁর কাছেই পেতাম। যতদূর মনে পড়ে, এই সময় কুমার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। কুমার রায় দিনাজপুরের ছেলে। দিনাজপুরের মেয়ে রমলা রায় ইতিমধ্যে তৃপ্তি মিত্রের শিষ্যা হয়েছিলেন।

চল্লিশের দশকে দিনাজপুর শুধু কৃষক-আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল না, নাট্য-আন্দোলনে এই জেলা অগ্রসর ছিল। নারায়ণবন্ধু সরকারের কথা মনে পড়ে। ইংরাজিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছিলেন তৃপ্তি মিত্র। কিন্তু এম. এ. না পড়ে নাট্য-আন্দোলনে মেতে ওঠেন। তাঁর আবৃত্তি এখনো যেন কানে বাজে। দিনাজপুর শহরে তৃপ্তি মিত্র আবৃত্তি করেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কবিতা "মধুবংশীর গলি"।

"যদি আর একবার" নাটক দেখি কুমারের সৌজন্যে। নাটকের শেষে তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে দেখা হল। সেই শেষ দেখা। এখনো যেন শুনতে পাই তাঁর কথা : 'সুনীলদা, আপনি এসেছেন ?'

বাঙলায় বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার বিবর্তন

নতুন পথের সন্ধানে

অমিতাভ রায়

ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ উৎপাদন-সরবরাহ সংক্রান্ত আইন ১৯৪৮-এ প্রণয়ন করা হয়। ইতিপূর্বে ১৯১০-এ বা তারও আগে এ বিষয়ে আইন থাকলেও ১৯৪৮-এর ইনডিয়ান ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) অ্যাক্ট যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রের মালিকানা মূলত বেসরকারি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই আইনের বলে ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ উৎপাদন সরকারি আওতায় আনার ব্যবস্থা হয়, ইনডিয়ান ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) অ্যাক্ট, ১৯৪৮ অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে নিজ রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়; পরবর্তী কালের সমস্ত নতুন বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রের নির্মাণ এবং পরিচালনার জন্য রাজ্য-সরকার-নির্মিত প্রতিষ্ঠানকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। চালু বেসরকারি বিদ্যুৎ-উৎপাদক সংস্থা ব্যতীত নতুন করে বেসরকারি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-উৎপাদন বন্ধের ব্যবস্থা হয়। দু-চারটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এই আইন সর্বত্র প্রযুক্ত হয়েছে।

ইনডিয়ান ইলেকট্রিসিটি (সাপ্লাই) অ্যাক্ট ১৯৪৮ অনুযায়ী ১৯৫০-এর ১লা মে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশনামা নং ২৭১৬/২এ-৫/৫৫ তারিখ ২৯শে এপ্রিল ১৯৫৫) মারফত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের উদ্যোগে নির্মিত প্রথম তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র হল ব্যানডেল তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র। কলকাতার উত্তর-পশ্চিমে ৫৬ কিলোমিটার দূরে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে এই বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটি অবস্থিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-লগ্নী প্রতিষ্ঠান ইউ. এস. এ. আই. ডি. (USAID) এবং পি. এল. ৪৮০ চুক্তিতে পাওয়া টাকায় এই বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রটি গঙ্গার ধারে কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের বিদ্যুৎ-ব্যবহার-কেন্দ্রের (লোড সেনটার) চাহিদা মেটাবার

জন্য তৈরি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি' বিদ্যুৎ উৎপাদনের যাবতীয় যন্ত্রপাতি সাজসরনজাম সরবরাহ ও সংস্থাপন করে। বাষ্প তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বয়লার হাউস ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য একটি সংস্থা 'ব্যাবকক্ অ্যানড উইল্‌ককস্' সরবরাহ ও সংস্থাপন করে চারটি ৮২·৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপিত হয়। ৪ঠা সেপটেমবর ১৯৬৫, ১৮ই অকটোবর ১৯৬৫, ১৭ই ফেবরুয়ারি ১৯৬৬, এবং ৩রা অগস্ট ১৯৬৬ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিট সংস্থাপিত হয়।

তারপর ১৬ বছর বাদে ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮২ চালু হল ব্যানডেলের পঞ্চম ইউনিট; ২১০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার এই ইউনিটটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় কারিগরি দক্ষতা এবং যন্ত্রপাতির সাহায্যে সংস্থাপিত হয়েছে। ভারত সরকারের সংস্থা ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (সংক্ষেপে ভেল) বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরি এবং সরবরাহ করেছে, আর বয়লার এবং বয়লার সংক্রান্ত অংশ সরবরাহ ও সংস্থাপন করেছে দুর্গাপুরের এ. বি. এল. সংস্থা।

অবিশ্যি ব্যানডেল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্থাপনের অনেক আগেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের স্বত্বাধিকারী হয়। ম্যাকলীন অ্যানড বেরী সংস্থার গৌরীপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই আনডারটেকিং; ১৯৬১-র সেপটেমবর মাসে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অধিগ্রহণ করে।

এখানে বলা দরকার, গৌরীপুর অধিগ্রহণের পর এবং ব্যানডেল সংস্থাপিত হবার আগেই কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ১৯৬৪-র ১১ই অগস্ট একটি তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করে। ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন ছিল। এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ফারাক্কার দুটি ১৫০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট সংস্থাপন করে। এই তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে "স্কোডা" নামক সংস্থা। প্রয়োজনীয় কয়লা রানীগঞ্জ এলাকা থেকে আনার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬১ নাগাদ পশ্চিম বাঙলা বিদ্যুৎসংকটের সম্মুখীন হয়। এই বছরের প্রথমার্ধে বিদ্যুৎসংকট এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে রাজ্য সরকার একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি সুপারিশ করে যে, ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সমতা রাখতে উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এই কমিটির অন্যান্য সুপারিশ-এর একটি অনুযায়ী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকেই পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদিতে একটি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়।

১৯৬৪-তে সাঁওতালদি সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ-পত্র দিল্লীতে ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পেশ করা হয়। ১৯৬৬-তে পরিকল্পনা কমিশন সাঁওতালদি প্রকল্প অনুমোদন করে। ১৯৬৫-তে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃপক্ষের আশা ছিল ১৯৬৯-৭০ নাগাদ সাঁওতালদি চালু হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি।

সাঁওতালদিতে চারটি ১২০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতার ইউনিট আছে। প্রথমটি চালু হয় ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৪। পরে ১৮ই অগস্ট, ১৯৭৫, ৬ই ডিসেমবর, ১৯৭৮ এবং ৩০শে মার্চ, ১৯৮১ যথাক্রমে সাঁওতালদির দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিট চালু হয়।

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে সাঁওতালদি-তে কয়লা পাওয়া যেমন সহজ, ঠিক তেমনি কঠিন জল সংগ্রহ। কয়লা আর জল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল রসদ। জলসংকটের কথা খেয়াল রেখেই সাঁওতালদি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র রূপায়িত হয়। বারো কিলোমিটার দীর্ঘ একটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে এখানে বিহারের তেন্নুঘাট জলাধার থেকে জল

আনা হয়।

সাঁওতালদি তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের আরও বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এখানকার যাবতীয় যন্ত্রপাতি-সাজ-সরনজাম সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতার ভিত্তিতে ভারতীয় সংস্থায় ভারতেই নির্মিত। তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে ভারতবর্ষ স্বয়ম্ভর হবার পর প্রথম যে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে এইসব সাজসরনজাম ব্যবহৃত হয় সাঁওতালদি তাদের একটি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, যে-কোনো কারণেই হোক, সাঁওতালদির চারটি ইউনিট কখনোই ভালো-ভাবে কাজ করতে পারে নি। এই ত্রুটি আজও অব্যাহত।

কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎপ্রকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা সত্তর দশকের গোড়ায় শুরু হয়েছিল। কাগজ-কলমের কাজ ছাড়াও যে-কোনো তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন—বিপুলায়তন জমি, যা সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ,—সেই জমিও ১৯৭৪-এ সংগৃহীত হয়ে যায়। তারপর বিভিন্ন কারণে কাজ কখনও শম্বুক গতিতে এগিয়েছে, কখনও বা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। অবশেষে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ১১ই জুলাই ১৯৮৪ কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎপ্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের তৃতীয় ইউনিটটি উৎপাদন শুরু করেছে। আর প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে ১৯৮৫-র ১৫ই ডিসেম্বর।

কলকাতা থেকে ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে রূপনারায়ণের কূলে মেদিনীপুর জেলায় কোলাঘাটে তাপবিদ্যুৎপ্রকল্প অবস্থিত। এখানে ২১০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ৬টি ইউনিট সংস্থাপিত হবার কথা। যন্ত্রপাতি মূলত ভারতীয়।

১৯৭৮-এ এই প্রকল্পের কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নানা কারণে এই প্রকল্পের কাজ নানাভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। ইতিমধ্যে তো প্রকল্পর মালিকানারই বদল ঘটে গেল। কিভাবে? দেখা যাক।

ইনডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাকট (১৯১০) ও ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই অ্যাকট (১৯৪৮) অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি কাজ করে। কোনো বিদ্যুৎ পর্ষদই সরাসরি সরকারি অর্থলগ্নি সংস্থা থেকে টাকা ধার নিতে পারে না। এদিকে কোলাঘাটের বড়ো মাপের প্রকল্পের জন্য প্রচুর টাকা দরকার। আবার কোলাঘাটের দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনটি ইউনিট ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালসকে 'টার্ন-কী' প্রক্রিয়ায় করবার দায়িত্ব দেওয়া হল। এর জন্য এক-কালীন টাকা প্রয়োজন। কিন্তু কোম্পানি আইন অনুযায়ী পরিচালিত যে-কোনো কোম্পানি সরকারি অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার নিতে সক্ষম। এইসব আইনি সমস্যার সমাধান করে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎপ্রকল্প দ্রুত রূপায়নের জন্য ১৯৮৫-র মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠন করলেন, "পশ্চিমবঙ্গ পাওয়ারডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন"। শুধু কোলাঘাট নিয়েই এদের কারবার। ১৯৮৭-র ১লা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কোলাঘাট প্রকল্পকে এদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ভারত সরকারের "ইনডাসট্রিয়াল ডেভেলপমেনট ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া" (আই. ডি. বি. আই) বিভিন্ন শর্তে এদের টাকা ধার দিচ্ছেন। এমনকী কর্পোরেশনের পরিচালনকমিটিতেও আই. বি. ডি. আই-এর প্রতিনিধি আছেন। কেউই হলফ করে বলতে পারছেন না এই প্রকল্প কবে শেষ হবে। এমনকী প্রথম পর্যায়ের প্রথম ইউনিটটি কবে কাজ শুরু করবে, তা-ও জানা যায় নি। অবশ্যই নির্ধারিত সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে।

তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বেশ কয়েকটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র সংস্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, সাবেক আমলের বেসরকারি মালিকানার কয়েকটি জলবিদ্যুৎপ্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ অধিগ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য,—দেশের প্রথম জলবিদ্যুৎকেন্দ্রটি, অর্থাৎ সিদ্রাবং জলবিদ্যুৎকেন্দ্র।

এটি ১৯৭৮-এ অধিগৃহীত হয়।

জলঢাকা নদীর উৎস সিকিমে অবস্থিত। সিকিম থেকে জলঢাকা ভূটানে প্রবেশের মুখে 'নি-চু' ও 'বিন্দুখোলা' নদীর জল জলঢাকায় মিশে জলঢাকার জলপ্রবাহকে সমৃদ্ধ করেছে। ভূটানে কিছুটা বয়ে যাবার পর জলঢাকা ভারত-ভূটান সীমানা বরাবর প্রায় কুড়ি কিলোমিটার যাবার পর জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটার কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে। পরে জলঢাকা ভারতের সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে ব্রহ্মপুত্র নদে মিশে গেছে। ভূটানের ভাষা 'জোংখা' অনুযায়ী 'চু' মানে নদী। যেমন ডি-চু, নি-চু, মো-চু, ওয়াং-চু প্রভৃতি। 'ডি-চু', মো-চু' ও 'ওয়াং-চু' বাঙলায় যথাক্রমে তিস্তা সঙ্কোষ ও রায়ডাক নামে পরিচিত। ডি-চু, জলঢাকা এবং নি-চুর জলকে ব্যারেজ দিয়ে বিন্দু-নামক জায়গায় বাঁধা হয়েছে। পরে প্রায় ছয় কিলোমিটার দূরে জলপাইগুড়ি জেলার চালসা-নামক জায়গা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের এক জায়গায় (আগে যা পারেশ নামে পরিচিত ছিল) সংস্থাপিত হয়েছে জলঢাকা জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। এই কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট ১৯৬৭-র মার্চ মাসে, দ্বিতীয় ইউনিট ১৯৬৭-র জুন মাসে এবং ১৯৭২-এর ১১ই অকটোবর তৃতীয় ইউনিট চালু হয়েছে। প্রতি ইউনিটের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ৯ মেগাওয়াট। প্রথম দুটি ইউনিট যুগোশ্লাভিয়ার "ইন্‌এ" সংস্থা স্থাপন করে। যন্ত্রপাতি সাজসরনজাম এদেরই তৈরি। জলঢাকা জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের দুটি চার মেগাওয়াট নিহিত ক্ষমতাসম্পন্ন ইউনিট ১৯৮৩-র অকটোবর মাস থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে।

দার্জিলিং জেলার সদর শহর দার্জিলিঙের কাছে বিজনবাড়ির নীচে লিট্‌ল্ রঙ্গিত নদীর জল ব্যবহার করে তৈরি হয়েছে লিট্‌ল্ রঙ্গিত জলবিদ্যুৎপ্রকল্প। ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার দুটি ইউনিট ঐখানে সংস্থাপিত হয়েছে। প্রথমটি ১৯৭০-এ এবং দ্বিতীয়টি ১৯৭১-এ চালু হয়েছে। মূলত দার্জিলিঙ শহরাঞ্চলের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্য এই প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিদ্যুৎ পর্ষদের উদ্যোগে সংস্থাপিত হয়।

দার্জিলিঙ জেলায় রিন্‌চিংটনে ১৯৭৯-র ৮ই মার্চ প্রতিটি ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার দুটি ইউনিট সংস্থাপিত হয়েছে। ২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার এই জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রটির যন্ত্রপাতি লিট্‌ল্ রঙ্গিত জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পের মতো সম্পূর্ণত ভারতে নির্মিত। এ ছাড়া, দার্জিলিঙ জেলার বিজন-বাড়িতে ৩০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার একটি জলবিদ্যুৎপ্রকল্প ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চালু আছে।

ইদানীং ডিজেল জেনারেটর আমাদের অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছে। ছোটো-বড়ো অফিস কারখানা, অবস্থাপন্ন গৃহ—সর্বত্রই লোড-শেডিঙ-থেকে 'মুক্তির উপায়' হিসাবে ডিজেল জেনারেটর উপস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল বিদ্যুৎব্যবস্থা থেকে অনেক দূরের ছোটো-ছোটো শহর, আধা-শহর প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বল্প নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপন শুরু হয়েছিল।

১৯৪৪-এ দার্জিলিঙ জেলার কালিম্পং শহরে ১৪০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার একটি ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে ১৯৫৬ (১৭৮ কিলোওয়াট) এবং ১৯৭৫-এ (একটি ৫৫ কিলোওয়াট এবং একটি ৪৮ কিলোওয়াট) এই প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হয়। মালদহ জেলার সদর শহর মালদহ-র কালিন্দী-র ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র, ১৯৬৫-তে তিনটি ৪৪০ কিলোওয়াট এবং তিনটি ৫৮৪ কিলো-ওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপনের মাধ্যমে চালু হয়। ১৯৬৮-তে এখানে আর-একটি ৫৮৪ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর

সংস্থাপিত হয়। কোচবিহার শহরে ১৯৫৬-তে ৩০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার একটি ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। ১৯৫৯ (১০০ কিলোওয়াট), ১৯৫০ (১০০ কিলোওয়াট), ১৯৬৪ (দুটি ২৫৬ কিলোওয়াট), ১৯৭০ (৫৮৪ কিলোওয়াট) এবং ১৯৭১-এ (দুটি ৪৪০ কিলোওয়াট) প্রকল্পটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানো হয়।

চাংড়াবাঁধায় প্রথম ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র ১৯৫৮-তে (একটি ৫৬ এবং একটি ৬০ কিলোওয়াট) সংস্থাপিত হয়। জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহর জলপাইগুড়িতে ১৯৫০-এ একটি ২৪২ কিলোওয়াট-এর ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। ১৯৫৯ (২৫৬ কিলোওয়াট), ১৯৬৫ (৪৪০ কিলোওয়াট) এবং ১৯৮৮-এ (৪৪০ কিলোওয়াট) প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হয়।

জলঢাকা জল-বিদ্যুৎপ্রকল্পের প্রয়োজনে ১৯৬৩-তে সেখানে দুটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। দীর্ঘার সমুদ্রসৈকতে প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বলে ওঠে ১৯৬৩-এ। একটি কিলোওয়াটের ডিজেল জেনারেটর এই সময় চালু হয়। ১৯৬৯-এ (৬৯ কিলোওয়াট), ১৯৭০-এ (৬৫ কিলোওয়াট) এবং ১৯৭১-এ (৭৫ কিলোওয়াট পর্যায়ক্রমে তিনটি ডিজেল জেনারেটর এখানে সংযোজিত হয়েছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবনসন্নিহিত পাথর-প্রতিমায় ১৯৭৩-এ চারটি (একটি ৪৮, একটি ৭৫ এবং দুটি ৬০ কিলোওয়াট) ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটে ১৯৫৭-তে একটি ৫৬ কিলোওয়াট নিহিত ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। পরে পর্যায়ক্রমে ১৯৫৯ (৫৬ কিলোওয়াট), ১৯৬৪ (১০০ কিলো-ওয়াট), ১৯৬৫ (দুটি ৬০ কিলোওয়াট), ১৯৬৬ (১০০ কিলোওয়াট), ১৯৬৯ (দুটি ১০০ কিলো-ওয়াট), ১৯৭৫-এ (৫৪৪ কিলোওয়াট) মোট আটটি ডিজেল জেনারেটর সংযোজিত হয়ে প্রকল্পটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১·১৭৬ মেগাওয়াট করলেও বর্তমানে এর উৎপাদনক্ষমতা ৬৫০ কিলোওয়াট।

জলপাইগুড়ি জেলার বীরপাড়ায় ১৯৫৫-তে একটি ৫০ কিলোওয়াটের ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। পরে ১৯৭১-এ একটি ২০০ কিলোওয়াটের এবং ১৯৭৩-এ দুটি ৬২০ কিলোওয়াটের ডিজেল জেনারেটর এখানে সংস্থাপিত হলে প্রকল্পটির নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতা ১·৪৯০ মেগাওয়াট হয়। বর্তমানে এই প্রকল্পের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা মাত্র ৪০০ কিলোওয়াট।

১৯৭২-এ বকখালির (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) সমুদ্রসৈকতে একটি ১৪ কিলোওয়াটের ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র সংস্থাপিত হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরে ১৯৬২-সালে দুটি ১০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। ১৯৬৫-তে একই প্রকল্পে ৩০০ কিলোওয়াটের আর-একটি জেনারেটর চালু হয়। ১৯৬৮-তে দুটি ১৬০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর এই প্রকল্পে সংস্থাপিত হয়। চাহিদা বাড়তে থাকায় ১৯৭৪-এ ৫৪৪ এবং ৫১২ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার দুটি জেনারেটর সংস্থাপন করে 'রায়গঞ্জ (নিউ)' ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র চালু করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার আর-একটি শহর ইসলামপুর। এখানে ৫ই জানুয়ারি, ১৯৬৮-তে একটি ১০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। এরপর ১৯৬৮-তে আরও একটি (৫৬ কিলোওয়াট), ৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৭৩-এ একটি (১০০ কিলোওয়াট) এবং ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭৪-এ একটি (৭৫ কিলোওয়াট) ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য খ্যাত দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরে ১৯৭২-এ তিনটি ১২৮ কিলোওয়াট, একটি ৩২ কিলোওয়াট এবং একটি ২৫ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। এখানে ১৯৭৫-এ আরও দুটি (একটি ১২৮ ও একটি ২৫ কিলোওয়াট) ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়।

দার্জিলিং শহরের সন্নিকটে চলবং-এ ১৯৩৮, ১৯৫১, ১৯৫৩ ও ১৯৬১-তে মোট ৫টি ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। এদের নিহিত উৎপাদনক্ষমতা যথাক্রমে ১৮৭, ২০০, ২৯৩ এবং ২৫০ (দুটি) কিলো-ওয়াট। উত্তর বাঙলার অন্যতম ব্যস্ত শহর শিলিগুড়িতে ১৯৫৭-য় দুটি (একটি ৩১২ ও একটি ৩৫২ কিলো-ওয়াট), ১৯৬৩-তে একটি (৩৫২ কিলোওয়াট), ১৯৭০-এ দুটি (একটি ৫৮৪ ও একটি ৫৬০ কিলো-ওয়াট), ১৯৭১-এ দুটি (৫৬০ কিলোওয়াট) ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। এ ছাড়া ১৯৭৭-এ শিলিগুড়িতেই দুটি ৩৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত হয়।

হলদিবাড়ির (জেলা—কোচবিহার) ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্র ১৯৫৮-য় (৫৬ কিলোওয়াট) সংস্থাপিত হয়। ১৯৬৮-তে একটি ৮৮ কিলোওয়াট এবং ১৯৭১-এ একটি (১২৮ কিলো-ওয়াট) ডিজেল জেনারেটর এখানে সংস্থাপিত হয়।

এখানে বলে রাখা ভালো যে ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রের উৎপাদনব্যয় যথেষ্ট বেশি হলেও চাহিদার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সংস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিবহণের উপযোগী বিভিন্ন ক্ষমতার রাজ্য বিদ্যুৎ পরিবহণ গ্রিডের সঙ্গে ডিজেল জেনারেটর কর্তৃক বিদ্যুৎ দ্বারা সেবিত অঞ্চল সংযুক্ত হওয়ার সাথে-সাথে ডিজেল-পরিচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র-গুলির উৎপাদন হ্রাস করা হয়েছে।

বর্তমানে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, জলবিদ্যুৎকেন্দ্র (উল্লিখিত) এবং ইতিপূর্বে উল্লিখিত ডিজেল-পরি-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদনকেন্দ্রগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মালিকানায় তিনটি গ্যাস টারবাইন প্রকল্প আছে। ১৯৭৯-তে কলকাতার কসবায় দুটি, মেদিনীপুর জেলার শিল্পাঞ্চল হলদিয়ায় দুটি এবং উত্তরবঙ্গের জনবহুল শহর শিলিগুড়িতে একটি—সর্বমোট ৫টি (প্রতিটির নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতা ২০ মেগাওয়াট) গ্যাস টার্বাইন সংস্থাপিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের উদ্যোগে দুর্গাপুরে একটি ইস্পাত প্রকল্প গড়ে ওঠে। একই সময়ে দুর্গাপুরে পশ্চিম বাঙলা সরকারের উদ্যোগে একটি কোক ওভেন প্রকল্প নির্মিত হয়,—যার নাম দুর্গাপুর প্রজেকটস লিমিটেড (ডি. পি. এল.)। পরবর্তী কালে ডি. পি. এল. তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৬০-এ দুটি ৩০ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার ইউনিট এখানে সংস্থাপিত হয়। পরে এখানে একটি ৭৫ মেগাওয়াটের ইউনিট ১৯৬৪-তে এবং দুটি ৭৫ মেগা-ওয়াটের ইউনিট ১৯৬৬-তে সংস্থাপিত হয়। ১৯৮৫-র ৩রা জুলাই ডি. পি. এল-এর ষষ্ঠ ইউনিট সংস্থাপিত হয়েছে। এটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ১১০ মেগা-ওয়াট। এই ইউনিটের প্রায় সব যন্ত্রপাতি-সাজ-সরনজামই ভারতীয়, মূলত ভারত হেভি ইলেকট্রি-ক্যালস্ লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত।

পশ্চিম বাঙলার বিদ্যুৎক্ষেত্রের আরেক অংশী-দারের নাম ডি. ভি. সি. বা দামোদর ভ্যালি কর্পো-রেশন। ডি. ভি. সি.-র জন্ম ১৯৪৮-এর ৭ই জুলাই হলেও, আবির্ভাবের আগে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। দামোদর নদ দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে একটি চিরকালীন যন্ত্রণা। পশ্চিম বাঙলার বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলা ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব বিহারের এক বিরাট অংশের মানুষ দামোদরের দাপটে বিব্রত। ব্রিটিশ সরকারও দামোদরের বিষয়ে চিন্তিত ছিল। তাদের চিন্তার কারণ কিন্তু মানুষ ছিল না। প্রতি

বছর দামোদরের বন্যায় বাঙলা-বিহারের লোহা-কয়লার খনি অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হত। সুতরাং ব্রিটিশ-রাজের এ প্রসঙ্গে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন ছিল। ১৮৬৩-তে ব্রিটিশ সরকার দামোদর নদের অববাহিকায় বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচ এবং নাব্যতা সমীক্ষার কাজ শুরু করে। পরবর্তী কালে এই সমীক্ষার সংযোজন হিসাবে ১৮৮৬-তে আর-একটি সমীক্ষা হয়। এই সমীক্ষায় সুপারিশ করা হয়—দামোদরের উপরে ১২টি এবং বরাকর নদের উপর ৬টি বাঁধ করা দরকার। সুপারিশটি ইংলণ্ডের ভারত বিষয়ক সচিবের কাছে পাঠানো হয়। তিনি সুপারিশটি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আবার প্রবল বন্যা হয়। তখন আবার প্রস্তাবটির বিবেচনা শুরু হয়। কিন্তু কোনো কাজের কাজ হয়নি। ১৯১৩-র অগস্ট মাসে দামোদর উপত্যকায় বিরাট বন্যা হয়। স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে এটিই দামোদর উপত্যকার সবচেয়ে বড়ো বন্যা। এই বন্যার পর জনমানসে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলিও হইচই শুরু করে। অতএব আবার সমীক্ষার কাজ শুরু হল। ১৯২০ পর্যন্ত সমীক্ষা চালিয়ে একটি পরিবর্তিত প্রস্তাব তৈরি করা হল। এই প্রস্তাবে বাঁধ এবং জলাধার নির্মাণের কথা বলা হয়; যথারীতি এই প্রস্তাবও বাস্তবায়িত হয় নি। ১৯৪৩-এ দামোদর উপত্যকায় আবার প্রবল বন্যার প্রকোপে বহু মানুষের জীবনহানি হয়। সুতরাং আবার একটি সমীক্ষা কমিটি তৈরি হল। দশ-সদস্য-বিশিষ্ট এই সমীক্ষা কমিটি তাঁদের প্রতিবেদনে বললেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদীর উপত্যকাকে যেভাবে বন্যার প্রকোপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে সেই একই পদ্ধতিতে দামোদর উপত্যকাকেও বন্যামুক্ত করা হবে। প্রতিবেদনটি পর্যবেক্ষণের জন্য ভারত সরকার সেনট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড গঠন করে। সেনট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড তাঁদের কাজকে যথাযথ করে তুলবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদীর উপত্যকার বন্যানিয়ন্ত্রণের কাজে অভিজ্ঞ ইনজিনিয়ার ডব্লু. এল. ভুরডিনের সাহায্য নেন। ভুরডিন যে সুপারিশ প্রস্তুত করেন তা বিবেচনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন প্রথিতযশা ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের কাজে সহায়তা করেন দুজন প্রখ্যাত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার এ. এন. খোসলা এবং এম. নরসিংহাইয়া। ভুরডিনের প্রস্তাব বিশেষজ্ঞরা অনুমোদন করেন। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য ভারত সরকার বাঙলা ও বিহার সরকারের সহযোগিতায় ১৯৪৬-এর মে মাসে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট্) গঠন করেন। পরে বিভিন্ন বিল, আইন প্রভৃতির মাধ্যমে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন বা ডি. ভি. সি.-তে রূপান্তরিত হয়।

দামোদর উপত্যকায় বন্যানিয়ন্ত্রণ, সেচকার্য, উন্নয়ন, জলসরবরাহব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, দামোদর ও সংশ্লিষ্ট নদীতে নাব্যতা সৃষ্টি, বনসৃজন ও ভূমিসংরক্ষণ প্রভৃতি লক্ষ্য নিয়ে ডি. ভি. সি. কাজ শুরু করে।

ডি. ভি. সি-র কাজের আঙিনা বিহার ও পশ্চিম বাঙলা—এই দুই রাজ্যেই বিস্তৃত। অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ডি. ভি. সি.-র পশ্চিম বাঙলার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের বিষয়টিই বর্তমান নিবন্ধে সীমায়িত থাকা বাঞ্ছনীয়।

বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দুর্গাপুর রেল-স্টেশনের পরের স্টেশন ওয়ারিয়া। এখানে ১৯৫০-এর অকটোবর মাসে ৭৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন-ক্ষমতার ডি. ভি. সি.-র দুর্গাপুর তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটটি চালু হয়। মাস পাঁচেক বাদে একই ক্ষমতার আরেকটি ইউনিট ১৯৫১-র ফেবরুয়ারি মাসে চালু হয়। দুর্গাপুরে ডি. ভি. সি.-র তৃতীয় ইউনিট (১৪০ মেগাওয়াট) ১৯৫৫ র ডিসেমবর মাসে চালু হয়। সম্প্রতি দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ২১০ মেগা-ওয়াট নিহিত উৎপাদনক্ষমতার চতুর্থ ইউনিট চালু হয়েছে। চতুর্থ ইউনিটটি সম্পূর্ণ ভারতীয় কারিগরি

দক্ষতা ও যন্ত্রপাতির উপর ভিত্তি করে সংস্থাপিত হয়েছে। আগের তিনটি আবার পুরোপুরি বিদেশী সহযোগিতায় নির্মিত। দুর্গাপুর ছাড়া পশ্চিমবাঙলা-বিহার সীমানায় মাইথনে আছে ডি. ভি. সি.-র অন্যতম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র। মাইথনের প্রথম ইউনিট ১৯৫৭-র অকটোবরে, দ্বিতীয় ইউনিট ১৯৫৮-র মে মাসে এবং তৃতীয় ইউনিট ১৯৫৮-র ডিসেমবরে চালু হয়। প্রতিটির নিহিত উৎপাদনক্ষমতা ২০ মেগাওয়াট। ডি. ভি. সি. মূলত কয়লাখনি-লোহাখনি সহ ঐ অঞ্চলের বড় বড় শিল্পগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। রেলকে বিদ্যুতের এক বড়ো অংশ ডি. ভি. সি. সরবরাহ করে। এ ছাড়া উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ বিহার ও পশ্চিমবাঙলায় সরবরাহ করার ব্যবস্থা ডি. ভি. সি.-র আছে। হিসাব অনুযায়ী কলকাতায় ডি. ভি. সি.-র ন্যূনতম ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিয়মিত আসার কথা। এই উদ্দেশ্যে কলকাতার সন্নিকটে হাওড়া শহরের দক্ষিণাংশে আন্দুল রোডে ডি. ভি. সি.-র রিসিভিং স্টেশন আছে। দুর্গাপুর থেকে এখানে সরাসরি বিদ্যুৎ আসে। ঐ বিদ্যুৎ সি. ই. এস. সি. কিনে নিয়ে বণ্টন করে। ডি. ভি. সি.-র অন্য তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি বিহারের বোকারো এবং চন্দ্র-পুরায় অবস্থিত। এ ছাড়া পাঞ্চেৎ এবং তিলাইয়ায় ডি. ভি. সি.-র অন্য দুটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত।

[শেষাংশ আগামী সংখ্যায়

চতুরঙ্গ অগস্ট ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য কিছু রচনার বিষয়বস্তু—

চীনের সাম্প্রতিক ছাত্রজাগরণ নিয়ে অধ্যাপক সুনীল সেনের সারগর্ভ বিশ্লেষণ।

ভাষাশিক্ষায় সংস্কৃতের স্থান নিরূপণ প্রয়াসে অধ্যাপক মনসুর মুসা এবং অধ্যাপক সুনীল সেনগুপ্তর নিবন্ধ।

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার কোণঠাসা অবস্থা সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক প্রদীপকুমার মজুমদার।

ভাষাসমস্যার আর-একদিক "হিন্দী উর্দু হিন্দুস্তানী" সম্পর্কে অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ।

ব্যক্তিত্বের সন্ধানে ভারতীয় নারী

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের সমাজব্যবস্থার কথা আমরা জানি। আবার একথাও আমাদের অজানা নয় যে, একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বে যে-কোনো সমাজই আপন ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অবিনশ্বরত্ব অর্জন করতে চায়। যে-সমস্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমাজ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একই ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা ও সংস্কৃতিকে অক্ষত রাখতে সচেষ্ট হয়, সামাজিকীকরণ (socialisation) তার মধ্যে একটি। এই প্রক্রিয়ায় সমাজ তার নির্দিষ্ট মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করে, প্রত্যেকেই যাতে সমাজ-নির্দেশিত ভূমিকা যথাযথ-ভাবে পালন করে—তা সুনিশ্চিত করে। কেননা, মর্যাদা-অনুসারী ভূমিকা পালিত হলেই সমাজে সুস্থিতি আসে। আর স্থিতিশীলতা যেহেতু সব সমাজেরই কাম্য, সেহেতু সামাজিকীকরণের চরিত্রও বিশ্বজনীন। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু সামাজিকীকরণের শিকার হলেও প্রধানত যৌবনের প্রারম্ভেই সমাজ তার সংস্কার-কুসংস্কারের ডালি নিয়ে সামাজিকীকরণের মৌলিক দায়িত্ব পালন করে এবং তার কাঙ্ক্ষিত ছাঁচে সদস্যদের ব্যক্তিত্ব এবং মানসিকতা গড়ে তোলে। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত অসংখ্য সামাজিক গোষ্ঠী সমাজের তরফে সামাজিকী-করণের দায়িত্ব পালন করে বলে ব্যক্তিমানুষেরও অনাচারে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ প্রায় শূন্য। তাই সামাজিক অনুগামিতা সুনিশ্চিত করে সমাজের মৌল কাঠামোর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু সামাজিকীকরণের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্কটি বেশ জটিল। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা যদিও সামাজিকীকরণেরই এক মাধ্যম, তবুও শিক্ষা আসলে একটি দুমুখো ছুরি। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক এমিল দুর্খেইম যখন শিক্ষাকে 'যুবসমাজের বিধিসম্মত সামাজিকীকরণ' বলে উল্লেখ করেন তাও যেমন ঠিক, তেমনি শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়েই যুগে-যুগে মানুষ জরদ্গব, অতীতগামী সামাজিক বিধিনিষেধের শৃঙ্খল ছিন্ন করে নতুন সমাজ গড়তে অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং শিক্ষা শুধুমাত্র পুরনো বা প্রচলিত সমাজকে ধারণ করারই নয়, নতুন সমাজ এবং নতুন মানুষ গড়ারও কারিগর। সুতরাং প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ ও অনুশাসনে মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবেই শিক্ষা এমন এক সামাজিক গতিশীলতা সঞ্চার করে যা প্রতিষ্ঠিত সমাজের পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল নাও হতে পারে।

অতএব, প্রকৃত মানবিক শিক্ষার সঙ্গে সামাজিকী-করণের একপ্রকার দড়িটানাটানির খেলা সর্বদাই চলে। কিন্তু এরই সঙ্গে যদি স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গটি এসে পড়ে, তাহলে ত্রিমুখী সম্পর্কবিন্যাসের ক্ষেত্রে যে একটি বিশেষ সমাজতাত্ত্বিক মাত্রা যুক্ত হয়ে পড়ে, তা বলাই বাহুল্য। কারণ পিতৃতান্ত্রিক পুরুষশাসিত সমাজে নারী বরাবরই বৈষম্যের শিকার। উন্নত ধনতান্ত্রিক এবং উন্নয়নশীল তৃতীয় দুনিয়া তো বটেই, এমনকী সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াও নারীসমস্যার মৌলিক সমাধান এখনো করতে পারে নি। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় পুরুষের আধিপত্য আজও অবিসংবাদিত সত্য। 'অবলা' মাতৃজাতির যথার্থ স্থান সুখী গৃহকোণে—এ ধারণা কেবল আমাদের দেশেই নয়, পাশ্চাত্যেও উচ্চারিত হয়। বস্তুতপক্ষে, নারীর বিশেষ শারীরিক গঠন, পুরুষের তুলনায় কম দৈহিক শক্তি, যৌন আবেদন আর প্রজননক্ষমতার জন্য নারীর যথার্থ সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে প্রায় সব সমাজেই এমন কিছু বদ্ধমূল ধারণা প্রচলিত আছে যে তার বাইরে যাবার কথা এমনকী মহিলারা নিজেরাও ভাবতে পারেন না। আদর্শ নারী বলতে যে রূপকল্প ভেসে ওঠে তার মধ্যে স্বাধীন, তেজস্বিনী নারীর পরিবর্তে বিনম্রচিত্ত, কোমলস্বভাবা, দয়াশীল মাতৃরূপেরই প্রাধান্য থাকে। এই রূপকল্পের সঙ্গে পিতৃ-অনুগত কন্যা, পতিব্রতা গৃহবধূ আর পরিবারের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ জননী হিসেবে নারীর আটপৌরে জীবনের সঙ্গতি সহজেই অনুমেয়। কিন্তু সমস্যা গভীরতর হয় তখনই যখন সমাজ অত্যন্ত সচেতনভাবে তার সামাজিকীকরণপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর এই সীমিত ভূমিকা উচ্চমার্গের নৈতিক আদর্শানুসারী বলে নারীপুরুষনির্বিশেষে সকলের মধ্যেই সংক্রামিত করে। এবং সর্ষের মধ্যে ভূতের মতো গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থাটাই যদি এই একই মূল্যবোধের দাস হয়ে পড়ে, তাহলে নারীর বঞ্চনা ষোলোকলায় পূর্ণ হতে আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না।

আমাদের দেশে অন্তত অবস্থাটা প্রায় এরকমই। রামমোহন-বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে যত সমাজ-সংস্কারক নারীমুক্তির প্রশ্নে ভাবনাচিন্তা বা সামাজিক আন্দোলন করেছেন, তাঁরা সকলেই স্ত্রীশিক্ষার উপর সবিশেষ কথা বলেছেন। স্বাধীন ভারতে নারী-পুরুষের সাম্যের আদর্শ শুধুমাত্র সংবিধানেই লিপিবদ্ধ হয় নি, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ সরকারি উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্ব এর সবটা না হলেও অনেকটা পরিচয়ই দিতে পারে। যেমন, মহিলাদের সাক্ষরতার হার ১৯৫১ সালে যেখানে ছিল শতকরা ৭'৯৩, ১৯৮১ সালেই তা বেড়ে শতকরা ২৪'৮৮ হারে দাঁড়ায়। আবার ওই একই সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নথিভুক্ত স্ত্রী-শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪ লক্ষ থেকে বাড়তে-বাড়তে প্রায় ৪ কোটিতে এসে পৌঁছয়। স্বাভাবিক কারণেই পুরুষের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে নারীর অগ্রগতি খুব একটা মন্দ বলে মনে হবে না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সূচনাপর্বে উচ্চশিক্ষার জগতে প্রতি ১০০ জন পুরুষে আমরা মাত্র ১৬ জন নারীকে খুঁজে পেতাম। কিন্তু আশির দশকে আমরা পাই ৪৫ জনকে।

এ ধরনের সংখ্যাতত্ত্বে অবশ্য আত্মতুষ্টির কোনো সুযোগ নেই। কারণ সামগ্রিক বিচারে শিক্ষার তুলাদণ্ড এখনো পুরুষের দিকেই ঝুঁকে আছে। সংখ্যার দিক থেকে তো বটেই, এমনকী গুণগত বিচারেও পুরুষেরা অগ্রগামী। প্রথমত, সাধারণভাবে গ্রামাঞ্চল, অনগ্রসর রাজ্য আর তপশিলভুক্ত উপজাতি এবং সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নারীশিক্ষার অগ্রগতি অত্যন্ত নিম্নমানের। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার ব্যাপারে, অর্থাৎ শিক্ষা অসমাপ্ত রাখতে মেয়েরা অনেক বেশি এগিয়ে। তৃতীয়ত, বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিশেষীকৃত বিষয়ে তাঁদের অনাগ্রহ সুপরিচিত। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও কলা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বা শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিভাগই যেন মেয়েদের জন্য সুনির্দিষ্ট। চতুর্থত, হিসেব করে দেখা গেছে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভরতি হওয়ার সুযোগ মহিলাদের যত বেশি, শিক্ষিকা হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ততটা নয়। পঞ্চমত, নারীশিক্ষার বিষয়টি এমন কতকগুলি সামাজিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল যার উপর নারীর নিজস্ব কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন, পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আয়, তাঁদের আগ্রহ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও গৃহের ভৌগোলিক ব্যবধান, নারীর পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বা গার্হস্থ্য দায়িত্বের সঙ্গে চাকুরি-জীবনের আপাত-বিরোধ ইত্যাদি বহু কিছুই নারীশিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে

Socialisation, Education and Women : Explorations in Gender Identity. Ed. Karuna Chanana. New Delhi, Orient Longman 1988. Rs. 150·00.

পারে। এর ওপরে রয়েছে সামাজিকীকরণের মতো ব্যবস্থা যা মহিলাদের ক্ষেত্রে অন্তত পরম্পরাকেই ধরে রাখতে চায়। একই পরিবারে কন্যাসন্তান আর পুত্রসন্তানকে এমনভাবে মানুষ করা হয় যে তাদের মধ্যে প্রাকৃতিক আর জৈবিক ব্যবধানই কালক্রমে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভূমিকার ব্যবধানে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফলে, পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে ধর্ম, মতাদর্শ, অতিকথা বা আচার-অনুষ্ঠান —সবকিছু সমাজে পুরুষের থেকে পৃথক নারীর "যোগ্য" স্থান ও ভূমিকা নির্ণয়ে ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

এ ধরনের দ্বিমুখী নীতি অবশ্য কারুর অজানা নয়, এবং সেজন্য আমরা অনেকেই হয়তো এখনো লজ্জা-বোধ করি না। কিন্তু যে তথ্যটা আমরা অনেকেই হয়তো খেয়াল করি না, দেখা যাবে যে তারই সামাজিক তাৎপর্য অসীম। কথাটা আসছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে। কারণ খুঁটিয়ে দেখলে অনেকেই আশ্চর্য হবেন যে, নারী-পুরুষের এই সামাজিক ব্যবধানকে সূক্ষ্মভাবে বজায় রাখতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও কম নয়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ছেলেদের আর মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় আর শ্রেণীকক্ষের কথা। এরপর আসে পাঠ্যবিষয়ের কথা। সেখানেও পুরুষত্ব ও নারীত্বের পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্টভাবে করা হয়। যেমন গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সূচীকর্ম মেয়েদের বিষয়, কিন্তু কারিগরি শিল্প কেবল ছেলেদেরই জন্য। বা ইনজিনীয়রিঙ পড়তে মেয়েরা যাবে না, কেননা তাদের জন্য রয়েছে দর্শন বা সাহিত্যের মতো সুকুমার চারুকলার বিষয়। এই প্রকার ধারণার শিকার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও হন। এমনকী সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা যেখানে প্রচলিত আছে সেখানেও ছাত্রীদের ফুটবল খেলতে দেওয়া হয় না। কেননা ফুটবল হল "পুরুষালি" খেলা। শুধু ছাত্রী বা ছাত্রদের বেলাতেই নয়, কর্মপ্রার্থী মহিলাদেরও এই লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক শ্রমবিভাজনকে মেনে নিতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষিকা এবং উচ্চ বিদ্যালয়ে পুরুষ শিক্ষকের নিয়োগ হামেশাই লক্ষ করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গোটা শিক্ষাব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামাজিকীকরণের সাযুজ্য রয়েছে। ফলে ছাত্র আর ছাত্রী—উভয়ের কাছে শিক্ষার তাৎপর্য ভিন্ন-ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। ছাত্র তার শিক্ষান্তে সামাজিক ভাঙা-গড়ার খেলায় যে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নেবে, ছাত্রীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ, নারীর কাছে শিক্ষার প্রত্যাশা হল আদর্শ গৃহবধূ আর মাতা হিসেবে তাকে গড়ে তোলা।

অতএব সমস্যার জট যে অনেক দূর প্রসারিত, তা বলাই বাহুল্য। কেননা এর সঙ্গে সামাজিক আর মনস্তাত্ত্বিক প্রসঙ্গও জড়িত। শিক্ষা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যাই হোক না কেন, জন্মলগ্ন থেকে যে মূল্যবোধ কন্যাসন্তানের মানসজগৎকে লালন-পালন করে, তার প্রতিক্রিয়া শিক্ষার ওপরে পড়তে বাধ্য। তাই নারীর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা, এবং তার কাছে পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের প্রত্যাশা —কোনো শিক্ষাক্রমই এই উভয় মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী? নারীর সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার পরি-প্রেক্ষিতে শিক্ষার ভূমিকা কী? সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার যুগ্ম প্রভাবে নারীর ভাবজগতে কী পরিবর্তন আসে এবং সমাজই বা এই পরিবর্তনকে কিভাবে নেয়? অথবা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নারীসমাজের সামনে কর্মজগতে প্রবেশের দ্বার কতটা উন্মুক্ত করে?

প্রশ্নগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, আমাদের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ধনতান্ত্রিক সমাজে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হলে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে পরম্পরানির্ভর সামাজিকীকরণের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হতেই হবে। তা না হলে অন্তত ভাবাদর্শের জগতেও নারী স্বমর্যাদায় আসীন হতে পারবে না।

আর জনসংখ্যার অর্ধাংশই যদি প্রকৃত মুক্তির স্বাদে বঞ্চিত থাকে, তাহলে সমাজের যথার্থ প্রগতি কখনোই হতে পারে না। তাই শিক্ষা, সামাজিকীকরণ এবং নারীর ভূমিকার পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয় অত্যন্ত জরুরি সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী নারীমুক্তি দশক পূর্তি পালনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যে-কোনো সমাজ-সচেতন মানুষের পক্ষেই কাম্য।

আলোচ্য সংকলনগ্রন্থের লেখকেরা সে আশা অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছেন বলে তাঁরা সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ১৯৮৫ সালে বিশ্বনারী-মুক্তিদশকপূর্তি উপলক্ষে দিল্লীর জওহরলাল নেহরু মিউজিয়াম ও লাইব্রেরির তরফে যে আলোচনাসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বর্তমান প্রবন্ধসংকলন তারই ফল। এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হল মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখার বিশেষজ্ঞরা একই বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার ফলে শিক্ষা আর সামাজিকীকরণের মিথস্ক্রিয়ার একটি সামগ্রিক পরিচয় আমরা পাই। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে নারীশিক্ষার প্রশ্নে সরকারি আর বেসরকারি যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়াও যেমন বিশ্লেষিত হয়েছে, তেমনি স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা-নীতির প্রকৃতিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেউ নির্ণয় করেছেন নারীর দেহকেন্দ্রিক সামাজিক ধ্যানধারণার প্রভাব, কেউ বা দেখিয়েছেন সচেতন প্রয়াসে ওই ধ্যানধারণার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার সার্থক প্রয়োগ। এই ব্যাপক অনুসন্ধানে সাহিত্য, নাটক, এমনকী দূরদর্শনের সিরিয়ালও বাদ পড়ে নি। সর্বোপরি অতীত আর বর্তমানের সফল নারীচরিত্রের আত্মকথনের মাধ্যমে নারীর আত্মানুসন্ধানের যে বাস্তববাদী চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা প্রকৃত অর্থেই গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

বিশ্লেষণের ব্যাপ্তিতে আর চিন্তার গভীরতায় সংকলনের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে পার্থ মুখার্জীর "সেক্স অ্যানড সোশ্যাল স্ট্রাকচার" প্রবন্ধটি। কারণ মৌলিক তত্ত্বগত প্রশ্ন একমাত্র তিনিই উত্থাপন করেছেন। বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় হিন্দুসমাজে নারীর সামাজিক ভূমিকার বিবর্তন, ভারতীয় ও অভারতীয় উপজাতীয় সমাজে নারীর স্থান, মূলধন-শাসিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক চীন ও ভিয়েতনামের সমাজে নারীর সামাজিক পদমর্যাদা ও ভূমিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে তিনি এমন কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসেছেন যার সঙ্গে চিরায়ত মার্কসীয় বিশ্লেষণের যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। তাঁর মতে, সামাজিক উৎপাদন আর শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে রাখার ফলেই নারীর সামাজিক মর্যাদার ক্রমাবনতি ঘটেছে। বৃত্তি ও পেশার স্ত্রী-পুরুষভিত্তিক শ্রম-বিভাজনের ফলেই নারী ক্রমশ জ্ঞান ও উৎপাদন-দক্ষতার জগতে প্রবেশের অধিকার হারিয়েছে বটে, কিন্তু প্রাচীনসমাজে বা উপজাতি সমাজে শ্রমবিভাজন-জনিত বৃত্তি নির্বাচনের সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল না বলে ওইসব সমাজে নারী সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয় নি। সুতরাং নারীর সামাজিক মর্যাদার অবনতির সঙ্গে অসাম্যভিত্তিক সামাজিক কাঠামোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। তাই সমাজের সামগ্রিক কাঠামো এবং সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে নারীমুক্তির সমস্যাকে বোঝা সম্ভব নয়। পার্থবাবু সমস্যার সমাধান না হলেও সম্যক উপলব্ধির উদ্দেশ্যে একটি মডেলের প্রস্তাবও দিয়েছেন। শ্রেণী, জাতি বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারী গৃহে বা বৃহত্তর সমাজে বৈষম্য, শোষণ বা নির্যাতনের শিকার হয় কিনা, নৈর্ব্যক্তিক, তথ্যনির্ভর সমীক্ষার সাহায্যে তা উদ্‌ঘাটন করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

লীলা দুবে ও বীণা দাসের লেখা নিবন্ধ দুটিতে নারীর জীবনবোধ বিকাশের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পাওয়া গেলেও সামাজিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায় না। তবে বেশ কিছু কঠিন সত্য উচ্চারণ

করেছেন লীলা হুবে তাঁর 'অন দ্য কনস্ট্রাকশন অব জেনডার' নিবন্ধে। আমাদের সমাজে জন্মলগ্ন থেকেই কন্যাসন্তান পুত্রসন্তানের তুলনায় অবহেলিত। পরের ঘর করার জন্যই যার ভাগ্য নির্দিষ্ট নতমস্তকে আনুগত্য প্রকাশ করাই তার পক্ষে শোভা পায়। কুমারী কন্যাকে দেবজ্ঞানে পূজা, ঋতুমতী নারীকে অশুচি জ্ঞান, যৌবনের সন্ধিক্ষণে পালিত আচার-অনুষ্ঠান, নারীর জীবনে তার যৌনতা ও শরীরী আবেদনের প্রভাব, এবং বিবাহ-সংক্রান্ত আচারব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে শ্রীমতী হুবে নির্মমভাবে দেখিয়েছেন সামাজিকীকরণপ্রক্রিয়ায় কিশোরী কন্যার যৌনতাকে এমনভাবে পরিচালিত করা হয় যে, বিবাহ ও মাতৃত্বকেই নারীজীবনের চরম সার্থকতা বলে প্রতিপন্ন করা হয়। এবং সমাজের কাছে এই সার্থকতা অর্জনের আদর্শ উপায় হল নারীর আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মত্যাগ আর কষ্টসহিষ্ণুতা।

নারী এই আত্মত্যাগের শিক্ষা সামাজিকীকরণ থেকেই পেয়ে থাকে। আদর্শবাদী মূল্যবোধে সিক্ত হয়ে নিজেকে এই উজাড় করে দেওয়া যতই মহনীয় হয়ে উঠুক না কেন, দেহাতীত তা কখনোই নয়। বীণা দাস তাঁর 'ফেমিনিটি অ্যানড দ্য ওরিয়েনটেশান টু দ্য বডি' প্রবন্ধে ঠিক একথাটাই বলতে চেয়েছেন। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানাবিধ সামাজিক সংস্কার নারীর দেহসৌষ্ঠবের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এমন ব্যক্তিত্বের আদর্শ আরোপিত করে যা সততই তাকে পুরুষসমাজ থেকে এক স্বতন্ত্র আসনে অধিষ্ঠিত করে। 'গায়ত্রীমন্ত্রে কেবল পুরুষেরই অধিকার', 'ক্ষুণ্নিবৃত্তি পুরুষের ধর্ম, নারীর ধর্ম উৎসব-অনুষ্ঠানে উপবাস পালন', 'ঋতুমতী নারী অপবিত্র', 'পুরুষের যৌন সম্ভোগের পাত্রী হিসেবে নারী'—ইত্যাদি নানা সংস্কারের বেড়াজালে পানজাবি নারীর 'নারীত্বে'র যে স্বরূপ শ্রীমতী দাস বিশ্লেষণ করেছেন, হিন্দুসমাজে তার প্রতিবিম্ব প্রায় সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই।

অতএব সমাজ তার নিজস্ব নিয়মে নারীর মানস-জগতেই যে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রোথিত করে, তার মূলোৎপাটন করা সহজসাধ্য নয়—এমনকী আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পক্ষেও নয়। রামমোহন রায়ের আমল থেকেই সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদরা আমাদের সমাজের এই অচলায়তন ভাঙার জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এসেছেন। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক নিবন্ধে অপর্ণা বসু, করুণা চানানা এবং মালবিকা কার্লেকার ভারতে নারীশিক্ষার সূচনাপর্বে যে সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তা নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের নারীশিক্ষানীতিকে কার্লেকার পরীক্ষা করেছেন পরাধীন ভারতবর্ষের বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। আশ্চর্যের বিষয়, কাদম্বিনী গাঙ্গুলিকে সফল চিকিৎসক হয়েও যে প্রবল সামাজিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আধুনিক কাদম্বিনীদেরও তার চেয়ে কম ঝামেলা সহ্য করতে হয় না। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা চেয়েছিলেন নারীর পরিবারকেন্দ্রিক আদর্শ মাতা-বধূ-কন্যা-র 'হোম জ'র সঙ্গে বহির্জগতের দাবির সমন্বয় সাধন করতে। সুতরাং নারীর বিশেষত্ব যাতে কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়, বরং আরো ভালো 'মাতা-বধূ-কন্যা' যাতে সে হতে পারে, শিক্ষাসংস্কারের উদ্দেশ্যকে তাঁরা এভাবেই দেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, স্বাধীনতার পরেও শিক্ষানীতিপ্রণয়নের ক্ষেত্রে মহিলা শিক্ষার্থীর বিশেষ 'মানসিক কাঠামো'র কথা মনে রেখে নার্সিং, হোম সায়েন্স, পথব্যবস্থাবিদ্যা বা চারুকলার প্রসারের দিকে এখনো আমরা গুরুত্ব দিয়ে চলেছি। এমনকী পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নিযুক্ত উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনও (১৯৮৪) এই দায়-ভাগ থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

বস্তুতপক্ষে শিক্ষিত নারীর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে আমরা যত ভাবনাচিন্তা করি, শিক্ষিত পুরুষকে নিয়ে ততটা করি না। আদর্শ স্ত্রী বা আদর্শ মায়ের

ভাবনা আমাদের যত আলোড়িত করে আদর্শ স্বামী বা আদর্শ পিতার ভূমিকায় পুরুষেরা কতটা সফল হলেন, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নই তুলেছেন করুণা চানানা। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে নারীশিক্ষার আন্দোলন বিস্তার লাভ করলেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবকে সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। তাই অরক্ষণীয়া পরদানশীন নারীর গতানুগতিক ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে শিক্ষাপরিকল্পনাতেও নারী-পুরুষের পৃথক-পৃথক ভূমিকাকে জোরালো করতে চাওয়া হয়েছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করলে এই সংকলনগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ অপর্ণা বসু ও মীনাক্ষী মুখার্জীর নিবন্ধ দুটি। ভারতীয় নারীমুক্তি আন্দোলনের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁদের কঠোর জীবনসংগ্রাম, মানসিক দৃঢ়তা ও মহান আত্মত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করে তাঁরা ভারতের সামাজিক ইতিহাসের ঝলমলোকিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন। স্বনামধন্য পণ্ডিতিয়া রমাবাঈ সরস্বতী, আনন্দীবাঈ কার্ভে, পার্বতীবাঈ আটাভেল, রমাবাঈ রাণাডে, বিদ্যাগোড়ী নীলকান্ত এবং শারদা মেহতা—এই ছয়জন মহীয়সী নারীর জীবনী ও আত্মকথনের সাহায্যে পশ্চিম ভারতের নারীশিক্ষা আন্দোলনের প্রায় একশত বৎসরের পথ-পরিক্রমাকে তুলে ধরেছেন অপর্ণা দেবী। লক্ষণীয় যে, পণ্ডিতিয়া রমাবাঈ ছাড়া আর কেউই কিন্তু 'পতিব্রতা সতী-সাধ্বী স্ত্রী'র আদর্শকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিকীকরণের উষালগ্নে সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কতিপয় নারী যে আপন সমাজে শিক্ষার আলো ছড়াতে অগ্রণী হয়েছিলেন, তার সামাজিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এই শিক্ষার ফলেই ভারতীয় নারীর আত্মানুসন্ধান এবং আত্মসমীক্ষার যে সমারোহের সূচনা হয়, মীনাক্ষী মুখার্জীর নিবন্ধে তার চিত্তাকর্ষক পরিচয় আমরা পাই। কেশবচন্দ্র সেনের মা সারদাসুন্দরী দেবী, কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী, প্রসন্নময়ী দেবী, বিনোদিনী দাসী ও মানদা দেবীর আত্মকাহিনী বিশ্লেষণের মাধ্যমে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর মনন ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-ধারাকে আধুনিক মননের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সমাজে পরম্পরাকে অস্বীকার করা ছিল প্রকৃতই দুঃসাধ্য। কিন্তু তারি মধ্যে "পূর্বকথা"-য় প্রসন্নময়ী দেবী ও "আমার কথা"-য় বিনোদিনী দাসী যে দৃপ্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও প্রতিবাদী মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা এখনো নারীমুক্তি আন্দোলনের আদর্শ বিবেচিত হতে পারে।

ভারতে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা মূলত হিন্দুসমাজ-কেন্দ্রিক হওয়ার ফলে ভারতীয় সমাজতত্ত্ব সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে এখনো মুক্ত হতে পারে নি। তাই যখন কোনো সমাজতত্ত্বের ছাত্র অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় নিয়ে গবেষণা করেন তখনই ভারতীয় সমাজতত্ত্বের সাবালকত্ব অর্জনের আশা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র এই কারণেই জারিনা ভাত্তির "সোশ্যালাইজিং অব দ্য ফিমেল মুসলিম চাইল্ড" এই সংকলনের একটি আকর্ষণীয় সংযোজন। হিন্দু সমাজে মহান আদর্শের আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে যে বৈষম্য নারীর প্রতি করা হয় ভারতীয় মুসলমান সমাজে তারই এক প্রকট রূপ দেখিয়েছেন জারিনা ভাত্তি। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারব্যবস্থা কন্যাসন্তানের সামাজিকীকরণের জন্য যে পরিমণ্ডল রচনা করে, জারিনার মতে তার মূল স্তম্ভ তিনটি : পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, সামাজিক মূল্যবোধকে অক্ষত রাখার জন্য নারীর দায়িত্ব এবং পারিবারিক 'ইজ্জৎ' রক্ষার নারীসুলভ কর্তব্য। পরদা ও জেনানা-প্রথা এবং পরিবার ও বিবাহের দাপটে সাধারণ মুসলমান কিশোরীর নিরুচ্চার ব্যক্তিত্বের বেদনা চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন জারিনা।

সামাজিকীকরণের মূল দায়িত্ব পরিবার ও রক্ত-

সম্পর্কীয় গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত হলেও সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি তথা মতাদর্শের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সামাজিক উপরিসৌধের অংশরূপে এরা দ্বান্দ্বিক চরিত্রের অধিকারী—একাধারে প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিশীল ভূমিকা তারা পালন করে। সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক উপাদান-কাঠামো ও শ্রমবিভাজনের প্রতিফলন যেমন তাতে ঘটে, তেমনি উত্তরণের প্রয়াসও শুরু হয় মতাদর্শের জগতেই। এ সম্পর্কে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল মৃণাল পাণ্ডের "উইমেন ইন ইণ্ডিয়ান থিয়েটার", সি. এস. লক্ষ্মীর "দ্য এডুকেটেড উইমেন ইন মডার্ন তামিল লিটরেচার", এবং প্রভা কৃষ্ণানের "জেনডার আইডিয়ালস্ ইন সায়েন্স ফিকশান"। নাটক, উপন্যাস বা দূরদর্শনের সিরিয়াল কত সূক্ষ্মভাবে যে পুরুষ-আধিপত্যের বীজ রোপণ করে চলেছে, তা বোঝার পক্ষে এই তিনটি প্রবন্ধপাঠই যথেষ্ট। আসল কথা হল, আমাদের শিল্প-সাহিত্য এখনো সামন্ততান্ত্রিক-পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বর্জন করতে পারে নি বলেই সাহিত্যিক বা নাট্যকার নির্যাতিতা মহিলাচরিত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে পুরুষের বেদনাকেও সমানভাবে তুলে ধরেন, যেমনটি করেছেন বিজয় তেণ্ডুলকর তাঁর "সখারাম বিন্দার" বা "কন্যাদান"-এ। অথবা সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী পুরুষের আত্মিক অবক্ষয়ের জন্য যখন কোন মহান নাট্যকার নাটকচরিত্রকেই দায়ী করেন (মোহন রাকেশ : "আষাঢ় কে এক দিন") তখন নারীর চিরন্তন সমস্যাকেই আসলে পুরুষের সমস্যারূপে উপস্থিত করা হয়। তামিল সাহিত্যে আধুনিক শিক্ষিতা নারীর যে ভাগ্যবিড়ম্বনা ফুটে উঠেছে অন্যত্রও তা বিরল নয়। কেননা 'চারুলতা'-দের জন্য "নষ্টনীড়"-এর চেয়ে ভালো কিছু কি বরাদ্দ হতে পারে!

কিন্তু না, সবটাই হতাশার অন্ধকারময় নয়। শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও নারীসমাজ এগিয়ে চলেছেন। এমনকী আমাদের দেশেও। সে কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন পুষ্পা সুন্দর ও বিভা পার্থসারথি। প্রথমোক্ত জনের বিষয় সেইসব সাহসী ও উদ্যোগী মহিলা যাঁরা আর্থিক বাধা, সামাজিক অবজ্ঞা ও অবহেলা উপেক্ষা করে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্যকে খর্ব করতে জোর কদমে এগিয়ে চলেছেন। আর বিভাদেবী দেখিয়েছেন, দূরদর্শিতা, পরিকল্পনা, দৃঢ় সংকল্প ও সদিচ্ছা থাকলেও অন্তত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেও নারী-পুরুষের সাম্যের পরিবেশ রচনা করা সম্ভব।

বস্তুতপক্ষে শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কেননা সামাজিকীকরণের ভূমিকা সর্বদাই রক্ষণশীল হলেও শিক্ষার যে আমূল সংস্কারবাদী বা বৈপ্লবিক ভূমিকা থাকে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের বিকাশই তা প্রমাণিত করে। তাই যে শিক্ষাব্যবস্থা তার অভ্যন্তরীণ কাঠামোর মধ্যেই বৈষম্যের বীজ রোপণ করে রেখেছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থারই সদ্ব্যবহার করে প্রগতিকামী নারী দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার সাহস অর্জন করেন। কিন্তু দুঃখ এই যে, ব্যতিক্রমী উদ্যোগগুলি এখনো পর্যন্ত কোনো সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। বর্তমান সংকলনের প্রবন্ধকারেরা এর কারণ সন্ধান করেছেন প্রধানত শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো ও পারিবারিক মূল্যবোধের মধ্যে। কিন্তু যে কথাটা অনুচ্চারিত থেকে গেছে, অথচ যাকে বাদ দিয়ে এ আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে না, সেটি হল মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গ। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় আর শিক্ষণ-পদ্ধতি এবং কন্যাসন্তানের সামাজিকীকরণ ও তার শিক্ষার প্রতি পরিবার-পরিজন বা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, কোন কিছুই আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মতাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যে উৎপাদনব্যবস্থায় মানুষমাত্রেই পণ্যে পরিণত হয়েছে সেই ব্যবস্থার সঙ্গে সামন্ত মূল্যবোধের অবৈধ প্রণয়ের জারজ সন্তানস্বরূপ পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ যে নারীকে সাধারণের সম্পত্তি ও

সম্ভোগের পাত্রী গণ্য করবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! তাই আমাদের মতো শোষণভিত্তিক সমাজে নারীকে অবশ্যই শোষণের বাড়তি বোঝা বহন করতে হয়। কিন্তু র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টদের মতো শ্রেণীশোষণ ও নারীনির্যাতনকে পরস্পরবিরোধী ও সম্পর্কশূন্য মনে করা কোনো কাজের কথা নয়। বরং শোষণমুক্তির জন্য শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করার মধ্যেই নারী তথা ব্যক্তিসত্তার মুক্তির বীজ নিহিত থাকে।

পার্থ মুখার্জী তাঁর প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, উৎপাদনকর্ম ও শিক্ষা থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসাই নারীর সামাজিক মর্যাদায় ক্রমাবনতির অন্যতম কারণ। বস্তুতপক্ষে, নারীজাতি যখন আপন ক্ষমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে সামাজিক উৎপাদনে স্বাধীনভাবে যোগদান করতে পারবে একমাত্র তখনই প্রকৃত সাম্যের পরিবেশ রচিত হতে পারবে। এর পরেও অবশ্য হাজার-হাজার বৎসর যাবৎ লালিত-পালিত পুরুষের মজ্জাগত পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের অবসান ঘটাতে অবিরাম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজন হবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ঠিক এই কর্মযজ্ঞই এখন চলছে। কিন্তু আমরা এখনো অনেক ধাপ পিছিয়ে। শ্রেণীশোষণের বর্তমান কাঠামো না ভেঙে আমরা কিছুতেই বেশিদূর এগোতে পারব না। তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেও চলবে না। বরং সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক সংস্কার, মূল্যবোধ, প্রথা এবং আচার-অনুষ্ঠানকে সচেতনভাবে বর্জন করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও যুক্তিবাদী পরিমণ্ডল সৃষ্টির কাজে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এবং এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী হতে হবে মহিলা-সমাজকেই। তাঁরা যত বেশি তাঁদের গণতান্ত্রিক-অধিকার-সচেতন হবেন ততই বেশি করে পুরুষের স্বীকৃতি আদায়ে সক্ষম হবেন। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত আন্দোলনের। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান সংকলনগ্রন্থটি যে ব্যাপক তথ্য-সহযোগে ভারতীয় নারীর প্রকৃত সামাজিক মর্যাদা নির্ণয়ে উদ্যোগী হয়েছে, কেবলমাত্র সেই কারণেই তাকে এই মতাদর্শগত আন্দোলনের অন্যতম হাতিয়ার গণ্য করা যায়। শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রকৃত সার্থকতা এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

"অনীক"-এর পঁচিশ বছর

কমলেন্দু ধর

গত পঁচিশ বছরে (১৯৬৪-১৯৮৮) মানব-সমাজের অভ্যন্তরে ও বহিরাবরণে বিভিন্ন ধারায় বিবর্তনের পথে অনেক মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন ভারতীয় সমাজ-কাঠামোর আমূল রূপান্তরের প্রশ্নে বা বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে। 'নির্ভীক নিরপেক্ষতার ভান' না করে "অনীক" প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যে স্থিত থেকে এ-জাতীয় আরো অনেক প্রশ্নেরই মুখোমুখি হয়েছে, বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। লক্ষ্যের এই স্থিরতা নিয়ে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, কেউবা সংশয় আর দ্বিধায় জড়িয়েও যেতে পারেন। কিন্তু অগ্রগতি চিন্তা-চেতনার চর্চায় অনীক-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অস্বীকার করতে পারেন না। এখানেই সময়ের প্রেক্ষায় "অনীক পঁচিশ বছর প্রবন্ধ-সংকলন"-এর রয়েছে আলাদা তাৎপর্য।

সংকলিত ১৫টি প্রবন্ধ অনীকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৬-র সময়সীমায় এবং কোনোরকম সুনির্দিষ্ট বিন্যাস ছাড়াই। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা দুটি ভাগে প্রবন্ধগুলিকে বিন্যস্ত করে নিচ্ছি। প্রথম অংশ, ভারতীয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষায় সংকলিত প্রবন্ধ। যেমন

অনীক পঁচিশ বছর প্রবন্ধসংকলন—সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী, রতন খাসনবিশ। ১৫০ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭। চল্লিশ টাকা।

তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ী / তরুণ রায়। কৃষক বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব / পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ভোজপুরের কৃষক সংগ্রাম / গৌতম ভদ্র। কৃষি প্রশ্ন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ / জয়দেব সেনগুপ্ত। অপারেশন বর্গা: প্রশাসন নির্ভর সংস্কারের সীমাবদ্ধতা/ রঙ্গলাল দাশগুপ্ত। ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে জাতপাত ও শ্রেণীয় ভূমিকা / নিমাই গোস্বামী। সৈয়দ আমির আলি: ইতিহাস ও মুসলিম রাজনীতি/ সুচরিতা সেন। সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে / তরুণ রায়। প্রসঙ্গ: ইন্দিরা গান্ধী / তরুণ রায়। এবং অপ-সাংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা / মোহন মুর্মু (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)। দ্বিতীয় অংশে, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সংকলিত প্রবন্ধ। যেমন, নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদ / সুচরিতা সেন। ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিন / নিমাই গোস্বামী। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ / নবেন্দু সাহা। চীনের কৃষি সমবায় ও মাও সে-তুঙের অর্থনীতি-চিন্তা / রঞ্জনকুমার মিত্র। এবং রয়েছে ড. বিজয়কুমার বসুর স্মৃতিচারণে মাও সে-তুঙ: প্রথম দেখা।

প্রথম অংশে সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষি প্রশ্ন তথা ভূমিসম্পর্ক। কৃষক-আর কৃষি-নির্ভর ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে এই গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। আর তা প্রয়োজনীয়ও। কারণ ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর মৌল রূপান্তরের প্রশ্নে কৃষক আর কৃষিই প্রধান সমস্যা। উপরন্তু এই দুই সমস্যার সম্যক বিশ্লেষণ-উপলব্ধির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হবে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করবে আগামী ভারতবর্ষের ইতিহাস। দেখা গেছে, এই বিষয়ে অজ্ঞতার অভাবে পূর্বের অনেক সিদ্ধান্ত ভারতবাসীকে ভুল পথে চালিত করেছে, বৈপ্লবিক আন্দোলনকে করেছে বিভ্রান্ত। ভুল থেকে শিক্ষা নেবার কথা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আবারও আমরা ভুলই করেছি। সমজাতীয় না হলেও অন্য রকম, তফাত এইমাত্র। তা তেভাগা-তেলেঙ্গানা হয়ে নকশালবাড়ি পর্যন্ত। বা চম্পারন থেকে অধুনা ভারতবর্ষের প্রান্ত থেকে প্রত্যন্ত পর্যন্ত। যদিও এসব কথার উপসংহারে উদ্ধৃতি তুলেই দেওয়া যায়, 'No uprising fails—each one is a step in a right direction.'

ভূমিসম্পর্কের সূত্রে কৃষক, কৃষি, কৃষক বিদ্রোহ তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের প্রেক্ষিতগুলির সম্পর্কে পাঠকরা বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের সূত্র কৃষি সম্পর্কিত পাঁচটি প্রবন্ধের মধ্যে পাবেন। এই প্রেক্ষিতগুলির পরম্পরায় আলোচিত হয়েছে তরুণ রায়ের মূল্যবান প্রবন্ধ তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশাল-বাড়ী। বা গ্রন্থসমালোচনা-ভিত্তিক গৌতম ভদ্রের লেখা ভোজপুরের কৃষক সংগ্রাম ও কৃষক বিদ্রোহ এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। কৃষি প্রশ্ন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে আলোচনায় জয়দেব সেনগুপ্ত ভারতবর্ষ দিয়ে সূচনা করেও সীমাবদ্ধ থেকেছেন বঙ্গদেশের মধ্যেই। লেখক অবশ্য বঙ্গ-দেশের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই দেখাতে পেরেছেন কীভাবে কৃষি প্রশ্নেও জাতীয়তাবাদ ক্রমশ সাম্প্র-দায়িকতায় রূপান্তরিত হয়—তা যেমন হিন্দু সাম্প্র-দায়িকতা, আবার মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাও। এবং লেখক সঠিকভাবেই সিদ্ধান্তে আসেন, 'বস্তুতপক্ষে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই দায়ী। কিন্তু ভূমিস্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কংগ্রেস ও হিন্দু জমিদার মহাজন শ্রেণীর ভূমিকা অনেক বেশী' (পৃ ১০৪)। পরিশেষে ১৯৭৭-এর পর বামফ্রন্ট অপারেশন বর্গা নিয়ে যে প্রচারমুখী কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তার সীমাবদ্ধতা নিয়ে, বিশেষ করে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন রঙ্গলাল দাশগুপ্ত। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখাটি নিঃসন্দেহে এ-সংকলনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বাস্তব অভিজ্ঞতার

নিরিখে গণ-চেতনায় সমৃদ্ধ সমাজরূপান্তরের অগ্রগামী শক্তি হিসাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলবার সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তিনি তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন পর্বে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে অক্সফোর্ডীয় বা উচ্চবর্গের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের স্বরূপটি তিনি স্পষ্ট করতে পেরেছেন। আবার এ-বিষয়ে পার্টির উচ্চ নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কেও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন—যা পাঠকদের জিজ্ঞাসু করে তুলবে। সঠিক পথে তথ্যের ভিত্তিতে পাঠককে জিজ্ঞাসু করে তোলাই তো লেখকের অন্যতম সার্থকতা। যেমন তরুণ রায়-এর সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি। 'মহান দেশপ্রেমিক', 'ফ্যাসিস্ট', 'ভারতের কুইসলিং' ইত্যাদি আরো অনেক প্রচলিত শব্দগুচ্ছের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে তথ্য ও যুক্তির নিরিখে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহে যে মূল্যায়ন তিনি উপস্থিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে অভিনবত্বের দাবি রাখে।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষায় দ্বিতীয় অংশের চারটি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করা যাক। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন বা মাও-এর জীবদ্দশাতেই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন এমন অনেক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়েছিল যেখানে মতাদর্শগত সমালোচনা, আত্মসমালোচনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এগিয়ে চলার পথ খুঁজে পেয়েছে। যেমন নিমাই গোস্বামীর ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিন লেখায় এর পরিচয় আমরা পাই। এবং চলার পথে স্ব-স্ব দেশের ক্ষুদ্র প্রান্তিক, জাতীয় স্বার্থের তুলনায় মার্কসবাদের বিশ্বজনীন আদর্শ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু স্তালিনের মৃত্যু, ক্রুশ্চভ থেকে গরবাচভদের ক্ষমতা পাওয়া, সোভিয়েত-চীন দ্বন্দ্ব, চীন-ভিয়েতনাম দ্বন্দ্ব বা একেবারে সাম্প্রতিক সোভিয়েত ও চীনের পরিবর্তন—সব মিলিয়ে মার্কসবাদের মৌলিক সত্য যে বিশ্ব-জনীনতা তার পরিবর্তে স্ব-স্ব দেশের ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক জাতীয় স্বার্থ অনেক বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। এবং আজ মার্কসবাদের মূল ভিত্তি শুধু সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার দিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে না, সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারাও আক্রান্ত হচ্ছে। 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ' প্রবন্ধে নবেন্দু সাহা ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত (পৃ ২৫০-৫১) তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েতের ভূমিকার যে তালিকাটি তুলে ধরেছেন তার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে সোভিয়েত কোন্ পথে এগিয়েছিল। আজকের সোভিয়েত বা চীনের রাষ্ট্রীয় ভূমিকা কিভাবে আবর্তিত হচ্ছে তার দিকে নজর দিলেও এ-সত্য প্রমাণিত হয়।

পরিশেষে প্রবন্ধগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণে একথা বলা যায় যে ভারতবর্ষের মৌল রূপান্তরে আগ্রহী ও অগ্রণী কর্মীদের সংকলন-গ্রন্থটি অনেক ক্ষেত্রেই সাহায্য করতে পারবে। বিশেষ করে, বস্তুবাদের মৌলিক সত্যে স্থিত থেকে জিজ্ঞাসা আর অনু-সন্ধিৎসাকে প্রসারিত করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে বুঝবার প্রয়োজনে সংকলন-গ্রন্থটি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে।

ভাষাবিজ্ঞানীর এ কোন্ শোচনীয় পরিণতি

মৃণাল নাথ

১৯৫৭ সাল ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে যতোটা না যুগান্তর বয়ে আনে চমস্কীয় বিপ্লবের ফলে তার চেয়েও বেশি বৈপ্লবিক বলা যেতে পারে ১৭৮৬ সালের স্যর উইলিয়ম জোনেজের দৃপ্ত উচ্চারণকে। জোনজ ঐ বছরের ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, গথিক ইত্যাদি ভাষাসমূহের সঙ্গে যে পারস্পরিক

তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান—হুমায়ুন আজাদ। বাংলা একাডেমী: ঢাকা। পঞ্চান্ন টাকা।

মিল রয়েছে তা কোনো আপত্তিক ব্যাপার নয়। তাঁর অনুমান ছিল এই ভাষাসমূহ এমন কোনো এক ভাষা থেকে উৎসারিত যা আজ বিলুপ্ত। তাঁর এই "উজ্জ্বল উদ্ধার" থেকেই পরে পণ্ডিতেরা কল্পনা করেন প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার, সেই ভাষাকে পুনর্গঠিত করেন, সূত্রপাত হয় আধুনিক ভাষাতত্ত্বের। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পিতৃপুরুষের সেই বক্তৃতার ২০২ বছরে স্মৃতি-তর্পণ করতে বাংলাদেশের অন্যতম (এবং একমাত্র?) ভাষাবিজ্ঞানী তুলনামূলক-ঐতিহাসিক (অতপর "তু-ঐ") ভাষাতত্ত্বের একটি বই লিখে ফেলেছেন, এবং লিখে ফেলেই হয়তো ভেবে নিয়েছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কবিতার অনুসরণে বলতে পারি—"হল অনবদ্য"। (আজাদ সাহেব 'ভাষাতত্ত্ব' শব্দটিকে পুরোনো মনে করেন, তাই 'ভাষাবিজ্ঞান' লেখেন, এ বিতর্কে যাওয়া এখানে অবান্তর। তিনি অনায়াসে, 'শাস্ত্র' শব্দটিকে অত্যন্ত আধুনিক মনে করেন!) আজাদ সাহেব "এ শাস্ত্রটি শেখানোর দায়িত্ব নেওয়ার পর বিপন্ন বোধ" করেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর কথাতেই জানতে পারি তাঁর এই বইটিই "বাঙলায় তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠগ্রন্থ লেখার প্রথম উদ্যোগ"। "প্রথম" হবার দাবি কর্ণের কবচকুণ্ডলের মতোই তাঁর সহজাত, যেমন তাঁর Pronominalization in Bengali (১৯৮৩) গ্রন্থের কিংবা "বাক্যতত্ত্ব" (১৯৮৪) গ্রন্থের blurb-এ তার স্বলিখিত সদম্ভ ঘোষণা দেখি। (এবং একথাও ঘোষণা করেন যে তাঁর সর্বনামায়ন বিষয়ক বইটি নাকি সুনীতিকুমারের মহান গ্রন্থ ODBL-এর পর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ!)

আলোচ্য বইটি সম্পর্কে তাঁর দাবি হয়তো কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্য, সর্বাংশে তো নয়ই। কারণ বই হিশেবে এটি হয়তো "প্রথম", কিন্তুতেই তা পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং বলা যায় তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের একটি বিকলাঙ্গ পুস্তক। বাংলায় প্রকাশিত ভাষাতত্ত্ব নামধেয় যাবতীয় পুস্তকের পক্ষপাতিত্ব যে তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের প্রতি তা আজাদ সাহেবের অজ্ঞাত নয় বলেই আমার অনুমান। এপার এবং ওপার বাংলায় প্রকাশিত যাবতীয় বই-এই তাত্ত্বিক আলোচনা দুর্লভ এমন কথা বলি কেমন করে যখন দেখি রফিকুল ইসলামের "ভাষাতত্ত্ব" (১৯৭৫), আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের "আধুনিক ভাষাতত্ত্ব" (১৯৮৬), সুকুমার সেনের "ভাষার ইতিবৃত্ত"-র মতো গ্রন্থসমূহ? ভাষিক উপাত্ত উপস্থাপনে ও বিশ্লেষণে সুকুমার সেন অনন্যসাধারণ; সংক্ষিপ্ত হলেও, তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন ইসলাম (১৯৭৫); মোরশেদের (১৯৮৬) পুস্তকে তু-ঐ ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে (দ্র. মোরশেদ ১৯৮৬: ১৬-২২৩) তা একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের মর্যাদা অনায়াসেই পেতে পারে।

আজাদ সাহেবের "প্রথম" শব্দটির প্রতি এমনই অবসেশান রয়ে গেছে যে, তাঁর সব কিছুই "বাঙলায় প্রথম" বলে দাবি জানানোর একটি প্রবণতা মজ্জাগত হয়ে গেছে। ভাষাতত্ত্বের কোনো নবীন ছাত্র (অথবা প্রবীণ পাঠক) তাঁর এই বইটি যদি পড়েন, তবে তিনি বুঝতে পারবেন চন্দ্ররেণু-বৃত্তির মাত্রাটা কেমন (plagiarism অর্থে 'চন্দ্ররেণু-বৃত্তি' শব্দটি সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থ থেকে আহৃত করে বাংলা ভাষাকে উপহার দিয়েছেন অধ্যাপক সুকুমার সেন [দ্র. সেন ১৯৭৮])। তু-ঐ ভাষাতত্ত্বে চন্দ্ররেণু-বৃত্তির উদাহরণ হিশেবে বইটি "প্রথম", (ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দ্বিতীয়)। তবে চন্দ্ররেণু-বৃত্তিতে যে তিনি অদ্বিতীয় তা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

মার্কিন লেখক অ্যান্থনি আরলোট্টো (১৯৭২) অত্যন্ত ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিয়ে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের একটি বই লিখেছিলেন। বইটি এদেশে অল্প-পঠিত, অল্প-প্রচলিত, এবং কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাতও বটে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে। আজাদ সাহেব বাক্যতত্ত্বে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, তু-ঐ ভাষাতত্ত্বে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধাও জাগে না যখন দেখি তিনি মডেল হিশেবে নিয়েছেন আরলোট্টোর

অত্যন্ত নিয়মানের বইটিকে। একথাও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না তু-ঐ ভাষাতত্ত্ব একেবারেই না বুঝে ঐ বইটিকে সরল অনুবাদের এক ক্লান্তিকর প্রয়াস করেছেন। একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ, কোথাও ঋণের স্বীকৃতিমাত্র নেই, একমাত্র দুটি জায়গা ছাড়া (দ্র. পৃ. ৪২, ১৬১)।

আজাদ সাহেব 'ভূমিকা'-তে জানান তিনি "তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতিতে" বিশ্বাসী, "তাই এই বইটিতে জোর" দিয়েছেন "তত্ত্ব ও পদ্ধতির ওপর"। সংশয় জাগে এখানেই। নিশ্চিতই তিনি "তত্ত্ব ও প্রণালি-পদ্ধতিতে" বিশ্বাসী, তবে এর সঙ্গে অনায়াসে সংযোজন করা যেতে পারে তিনি বিশ্বাসী এসবের অনুবাদে এবং তা স্বনামে বেনামে লুম চালিয়ে দিতে যথাযোগ্য উল্লেখ বিনা। 'ভূমিকা'য় বারংবার এসব কথা শুনলে উচ্চ কণ্ঠে নিনাদিনী মাতা সম্পর্কিত প্রচলিত প্রাকৃত বাংলা প্রবাদ স্মরণে আসে। তাঁর বইটি পাঠান্তে একটি ধারণা করে নিতে কোনো অসুবিধে হয় না যে তিনি তু-ঐ ভাষাতত্ত্বে "অন্ধারপ্রবেশ" করেছেন (শব্দটি সম্পর্কে ঋণ স্বীকার: অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় [১৯৮৯])। তু-ঐ ভাষাতত্ত্বে যাঁর অসীম অজ্ঞতা, মুগ্ধতা যাঁর একমাত্র অনুবাদে, তত্ত্বে তাঁর আস্থা থাকতেই পারে না, আর বিষয়ের ওপর সম্যক জ্ঞান ও দখল না থাকায় কিছু প্রচলিত, প্রায়-অপ্রচলিত, এবং অপাংক্তেয় যাবতীয় সাবেকি পুস্তকের দ্বারস্থ হয়ে যাবতীয় তথ্য সমাহৃত করেছেন। "বিপন্ন বোধ" তিনি এ শাস্ত্রটি পড়াতে গিয়েই করেন নি, বইটি লিখতে গিয়েও ততোধিক বিপন্ন হয়েছেন, ফলে তাঁর অধ্যায়-সজ্জায় তেমন পারম্পর্য রক্ষিত হয় নি। পাঠককেও দিতে পারেন নি তু-ঐ ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা। পেশাগত কারণে এবং ছাত্রদের প্রয়োজনে বর্তমান সমালোচককে শাস্ত্রটির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পর্ক রাখতে হয়, তাই পূর্ণাঙ্গ তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের কোনো পুস্তকে কী থাকা উচিত সে বিষয়ে আজাদ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে মনে করি। সেই বই-এ সর্বপ্রথমেই থাকবে ধ্বনি-পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা, সে-সম্পর্কিত তত্ত্ব-সমূহ, ধ্বনি-সূত্র ও ধ্বনি-পরিবর্তনের প্রক্রিয়া-সমূহের আধুনিক আলোচনা; তুলনামূলক পদ্ধতি (বা পুনর্গঠন), আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ (এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাবংশ); ব্যাকরণগত পরিবর্তন (রূপতাত্ত্বিক, বাক্যিক এবং সাদৃশ্যগত পরিবর্তন); বাগর্থগত পরিবর্তন (semantic change); ভাষা-সংযোগের (language in contact) ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিসমূহ: কোড-সরণ (code-shifting) ইত্যাদি, ঋণকৃতি (borrowing), পিজিন-ক্রেয়ল, এবং ভাষা-অঞ্চল (language area) সম্পর্কিত তথ্য; লিখন-রীতির ইতিহাস। আরো যা থাকবে তা হল রূপান্তরী-সঞ্জননী (transformational-generative) মডেল এবং তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের আলোচনা। ঐচ্ছিক বিষয় হিশেবে অন্তর্গত করা যেতে পারে শব্দ-সংখ্যাতত্ত্ব (lexicostatistics) এবং উপভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনা।

আজাদ সাহেবের মুশকিল হয়েছে তিনি আরলোট্টোর (১৯৭২) বইটিকে মূল কাঠামো হিশেবে ধরেছেন, অধ্যায়-বিভাজনও প্রায় অনুরূপভাবে করেছেন। আরলোট্টো (১৯৭২) ছাড়াও তিনি অন্য কয়েকটি বই থেকে নকল করেছেন, তা হল লেমানের (১৯৬২) এবং অ্যানডারসনের (১৯৭২) বই দুটি। অথচ জানি না তাঁর জানা নেই কিনা তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের বেশ কিছু প্রামাণিক পুস্তক প্রচলিত রয়েছে পাঠ্য হিশেবে, যেমন রাইমো অ্যানটিলা (১৯৭২), থিয়োডোরা বাইনন (১৯৭৯), জীন (জঁা?) এচিসন (১৯৮১), হানস হাইনরিশ হক (১৯৮৬)। ভারতীয় পণ্ডিত ডি. এন. এস. ভাটের (১৯৭২) ধ্বনি-পরিবর্তন বিষয়ক একটি বই-ও উল্লেখনীয়। প্রথম তিনটি বই—বিশেষ করে প্রথমটি—যেকোনো প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে একটু দুরূহ এবং দুর্বোধ্য হতেই পারে, তাই স্বাভাবিক কারণেই তিনি দুরূহ বজায় রেখেছেন।

তুলনায় এচিসনের (১৯৮১) কিংবা ভাটের (১৯৭২) বইটি সহজলভ্য এবং অতি সহজপাচ্য। আজাদ সাহেব এ দুটি গ্রন্থের ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিলে উপকৃত হতেন। তিনি কিছু নতুন তত্ত্ব বা ধারণা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হতে পারতেন, তাঁর বই-এ অনুবাদের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করলে পাঠকদের প্রতি সুবিচারও করতেন। যেমন ধ্বনি-পরিবর্তন বিষয়ক আধুনিক তত্ত্ব। তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ধ্বনি-পরিবর্তন। তাঁর বই-এর ধ্বনি-পরিবর্তন-বিষয়ক পরিচ্ছেদে তিনি যেসব আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত সাবেকি এবং মামুলি ধরনের। ধ্বনি-পরিবর্তনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা, নব্য ব্যাকরণ-বিদদের ইস্তাহার ইত্যাদি বিন্দুমাত্র স্থান পায় নি। [অবশ্য 'অবতরণিকা'য় রাস্কোভস্কিয় (১৯৭২) বই থেকে সামান্য পরিমাণে অনুবাদে তা দিয়েছেন।]

ছয়ের দশকে ধ্বনি-পরিবর্তনের তাত্ত্বিক কাঠামোয় এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এই দশকেই উইলিয়ম লেবভ (১৯৬৩, ১৯৬৬) ধ্বনি-পরিবর্তনের সামাজিক প্রেষণার তত্ত্ব, এবং ওয়াইনরাইশ, লেবভ ও হার্জোগ (১৯৬৮) ভাষা-পরিবর্তনের এক তাত্ত্বিক দলিল দাখিল করেন এক যুগান্তকারী প্রবন্ধে। প্রায় একই সময়ে উইলিয়ম ওয়াং (১৯৬৯) নব্য ব্যাকরণবিদদের ব্যতিক্রমহীন যান্ত্রিক ধ্বনি-পরিবর্তনের ইস্তাহারের বিরুদ্ধে এক নয়া ইস্তাহার প্রকাশ করেন। নব্য ব্যাকরণবিদদের বক্তব্যের অবৈজ্ঞানিকতাকে তুলে ধরেন তাঁর প্রবন্ধে। লেবভ মার্থাজি ভাইনইয়ার্ডের (Martha's Vineyard) গবেষণায় (১৯৬৩) এবং নিউ ইয়র্কের (১৯৬৬) ভাষার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে ধ্বনি-পরিবর্তনের পেছনে যে সামাজিক প্রেষণা (social motivation) কাজ করে তা আমাদের জানান; অপরদিকে ওয়াং (১৯৬৯) দেখালেন যে হঠাৎ কোনো এক কাক-ডাকা সকালে কোনো ধ্বনি-পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে সকল শব্দে সংক্রামিত হয় না, তা হয় বেশ ধীর গতিতে শব্দ থেকে শব্দে সে পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়, ধ্বনিগত-ভাবে তা আকস্মিক (abrupt), শব্দগতভাবে ধীর (gradual) গতিতে ধ্বনি-পরিবর্তনের ব্যাপন ঘটে থাকে, রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখালে তা হয় সর্পিল রেখায় (S-curve-এ)। ওয়াং-এর এই তত্ত্বকে বলা হয় শাব্দিক ব্যাপন (lexical diffusion)। ধ্বনি-পরিবর্তন বিষয়ে পণ্ডিতদের উপরি-উক্ত আলোচনা ব্যতীত তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের কোনো বই-ই পূর্ণাঙ্গতার দাবি করলে তা অসঙ্গত এবং অসমীচীন বলে বিবেচিত হবে। আরলোট্টোর (১৯৭২) এবং অ্যানডারসনের বই-এ এ দুটি বিষয়ই অনুপস্থিত, আর লেমান যেহেতু বইটি ১৯৬২ সালে লিখেছেন, এসবের অনুল্লেখ স্বাভাবিক। এই কারণেই এই তিনটি গ্রন্থ থেকে অনুবাদের সুযোগ তাঁর নেই। তা ছাড়া, আজকের তু-ঐ ভাষাতত্ত্বে (এবং সমাজভাষাবিজ্ঞানে) ভাষা-সংযোগ একটি অপরিহার্য আলোচ্য বিষয়। আজাদ সাহেব ভাষা-সংযোগের ফলে উদ্ভূত "ঋণকরণ" (borrowing)-কে সাদৃশ্যমূলক পরিবর্তনের সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করেছেন। "তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতিতে" যাঁর অসীম বিশ্বাস, যিনি "প্রথম" তু-ঐ ভাষাতত্ত্বের বই লিখছেন, তিনি যখন সেই শাস্ত্রের এলাকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন, তখনি বোঝা যায় তাঁর গলদটা কোথায়। আমাদের তখন আর বুঝতে কোনো অসুবিধেই হয়না তাঁর অটল বিশ্বাস কিসে—অপরকৃত গ্রন্থের অনুবাদককে নিজের বলে চালানোতে—অর্থাৎ কুম্ভীলক-বৃত্তিতে। আমাদের জানা একান্তই জরুরি এই কুম্ভীলক-বৃত্তির ধরনটা কী রকম।

যখন কোনো বই বা প্রবন্ধ লেখা হয় লেখক সব সময়ই তার উৎস বা সূত্রকে হয় টীকার সাহায্যে সূচিত করেন অথবা বন্ধনীভুক্ত করে তার সূত্রনির্দেশ করে থাকেন। এ সমস্ত অ্যাকাডেমিক শিষ্টাচারের অন্তর্গত। আজাদ সাহেব এ সবের কোনোরকম তোয়াক্কাই করেন না। তিনি তখনি সূত্র-নির্দেশ করেন যখন তিনি বোঝেন যে তাঁর হাতে-নাতে ধরা

পড়ে যাবার ভয় আছে—অর্থাৎ বইটি বহুল পঠিত বা প্রচলিত। সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন বা পি. ডি. গুণের উৎস নির্দেশের বেলায় তিনি পরম ধার্মিক এবং অতি সদাচারী পণ্ডিত, কিন্তু আরলোট্টো (১৯৭২), অ্যাণ্ডারসন (১৯৭৩), লেমান-এর (১৯৬২) সূত্র-নির্দেশ বিরলতার পর্যায়ে পড়ে। বেন্ট জ্যাকবসেন (১৯৭৭)-কে তো আদৌ করেন না। (তাঁর "বাক্যতত্ত্ব" (১৯৮৪) নামক বইটিতে তো একবারও করেন নি। সে কথায় পরে আসব।) যেমন আজাদ সাহেব 'অবতরণিকা'-য় "প্রথাগত ব্যাকরণ-তুলনামূলক-কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান-বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান" ইত্যাদির আলোচনা করেছেন, এবং সবশেষে একটি 'চিত্র' দিয়েছেন (দ্র. পৃ. ৫), তাঁর সমস্ত আলোচনাই জ্যাকবসেন (১৯৭৭ : ৪৫-৬১) অনুসারী, মায় 'চিত্র'টিও (জ্যাকবসেন ১৯৭৭ : ৬১)। (এই একই 'চিত্র' তাঁর অপর গ্রন্থে রয়েছে, একই আলোচনা, সেখানেও জ্যাকবসেন অনুল্লেখিত (দ্র. আজাদ ১৯৮৪ : ৪৫৭-৪৬১।) কোথাও সূত্র-উল্লেখ নেই! আরো মজার ব্যাপার হল তাঁর গ্রন্থের ১১ থেকে ১৭ পৃষ্ঠার বিষয়। এখানে কী করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক-রাজনৈতিক ইত্যাদি কারণে এক ভাষা থেকে পৃথক পৃথক ভাষার উদ্ভব হয় তা বর্ণনা করেছেন। এই অংশে তিনি মোট ছটি 'চিত্র' দিয়েছেন, আরলোট্টো-র বই-এ (১৯৭২ : ৫-৯) একই আলোচনা এবং এই ছটি 'চিত্র'-ই রয়েছে। সামান্য অদল-বদল করেছেন চারটি 'চিত্র'-কে, বাকি দুটো হুবহু এক। সূত্রের সামান্যতম উল্লেখও নেই। তাঁর বই-এ 'অবতরণিকা'-য় তিনি মোট ১৮ পৃষ্ঠা (পৃ. ২০-৩৭) ব্যয় করেছেন "তুলনা-মূলক ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাস" রচনায়। ইংরেজি বই-পড়া পাঠক লেখকের মৌলিকতায় মুগ্ধ হয়ে হয়তো ভাববেন এমন তথ্যসহ আলোচনা তো ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের কোনো পুস্তকে লভ্য নয়। লেখককে তিনি অভিনন্দিত করতে উৎসাহী বোধ করবেন এমন একটি মূল্যবান অংশ প্রাথমিক সূত্র থেকে সংগ্রহ করে সংযোজিত করেছেন বলে। কিন্তু পাঠক যদি য়াস্কোভস্কির (১৯৭২) বইটি পড়ে থাকেন তার ভুল অচিরেই ভাঙবে। এই অংশটুকুর কোথাও য়াস্কোভস্কির বই-এর তর্জমা, কোথাও বা সংক্ষিপ্তসার, অথচ তা এমন কৌশলে উপস্থাপিত যে পাঠক মনে করবেন মূল সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গ্রথিত হয়েছে। কিছু নমুনা দিলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হবে :

১. "ব্যাপারটি বোঝানোর জন্য একটি প্রকল্পিত উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করা যাক বিশেষ ভৌগোলিক এলাকার অধিবাসীরা 'ক' নামক ভাষাটি বলে। আর মনে করা যাক ওই ভাষা-এলাকাটির দুদিকে আছে সমুদ্র, একদিকে পর্বতমালা, আরেকদিকে বড়ো নদী।..." (পৃ. ১৩)

...let us consider a hypothetical case. In a particular geographical area, we find the speakers of language A. Now the region inhabited by these people is bounded by the sea on two sides, by mountains on another side, and by a large river on the fourth side. (আরলোট্টো ১৯৭২ : ৬)

২. লাইবনিৎসের মতো জোনসের কোনো দার্শনিক অভিলাষ ছিল না; তবে তাঁরা দুজনেই বিশুদ্ধ মানবিক লক্ষ্য থেকে ভাষা বর্ণনায় উৎসাহী হয়েছিলেন।"

In contrast to Leibnitz, Sir William Jones hardly possessed philosophical ambitions. There is, however, a striking similarity between the two scholars as to the motives of their dealings with language. They both approach language for purely humanistic objectives. (য়াস্কোভস্কি ১৯৭২ : ২৪-২৫)

৩. "কুরিলোভিকস বৃষ্টি ও পয়ঃপ্রণালির সাথে তুলনা করেছেন সাদৃশ্যকে; কেউ জানে না কখন বৃষ্টি হবে, তবে হলে বৃষ্টিধারার স্রোত কোনদিকে বইবে তা বলতে পারে যে কেউ যার পরিচয় রয়েছে শহরের

পয়ঃপ্রণালির সাথে"। (পৃ. ১৩৩)

"In a comparison with drainage system, Kurylowick claims that analogy is like rain. Nobody can tell when it's going to rain, but when it does anyone who knows the plan of the local drainpipes and gutters can tell the way the water is going to flow."

(আরলোট্টো ১৯৭২ : ১৩৫-১৩৬)

এ সমস্তই অনুবাদ; আশ্চর্যের বিষয়, কোথাও সূত্র উদ্ধৃত হয় নি। তাঁর সমস্ত বই-এ ছড়িয়ে আছে এমন হাজারো দৃষ্টান্ত—উদ্ধৃত করলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাবে।

আজাদ সাহেবের বইটির সমস্ত অংশই কুম্ভীলক-বৃত্তির এক বিস্ময়কর, তথা চরম নিদর্শন। তাঁর বই-এর সপ্তম পরিচ্ছেদটি সাদৃশ্য (analogy) এবং "ঋণকরণ" (borrowing) বিষয়ক। ভাষাতত্ত্বে সাদৃশ্য বিষয়ে দুই পোলিশ ভাষাতাত্ত্বিকের দুটি পৃথক তত্ত্ব আছে। একজন হলেন কুরিলোউইকস (Kurylowicz), অপরজন মানচেজাক (Manezak) (এঁদের নামের উচ্চারণ সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই)। যেহেতু উভয়ের প্রবন্ধই ফরাসিতে লেখা, অনুমান করতে কোনো বাধা নেই যে আজাদ সাহেব ফরাসি ভাষায় অনধিগম্যতার জন্য তা পড়ে উঠতে পারেন নি। কুরিলোউইকসের (১৯৪৭/১৯৬৬) ছটি সূত্র-সমন্বিত প্রবন্ধটি বেশ জটিল, দুরূহ এবং দুর্বোধ্যও বটে। আরলোট্টো (১৯৭২ : ১৩৫-১৪৩) তাঁর পুস্তকে এর একটি অতি সরলীকৃত রূপ উপস্থাপিত করেছেন, তিনি ষষ্ঠ সূত্রটি প্রথমে স্থাপন করে, অপর পাঁচটি সূত্র পরে গ্রথিত করেছেন। এখানে আজাদ সাহেব একেবারে সেই মক্ষিকা-হন্তা করণিক—আরলোট্টোর হুবহু তর্জমা একইভাবে করেছেন। মানচেজাকের (১৯৫৮, ১৯৭৮) 'প্রবণতা' (tendances) তথা 'সূত্র' (lois) সম্পর্কে আরলোট্টো নীরব। লেমান (১৯৬২ : ১৯৮৯-১৯০) মোট চারটি সূত্রের বর্ণনা দিয়েছেন অতি সংক্ষেপে, আজাদ সাহেব অতি অক্ষম অনুবাদে হাজির করেছেন ঐ চারটি সূত্রকেই। তাঁর পুস্তকের নবম পরিচ্ছেদটি "আর্থ পরিবর্তন" (semantic change)। এই অধ্যায়টির তাত্ত্বিক অংশের জন্য তিনি প্রধানত ঋণী আরলোট্টো (১৯৭২) এবং উলমান (১৯৫১)-এর কাছে। উলমান অত্যন্ত গৌণভাবে ছুবার উপস্থিত (পৃ. ১৫১, ১৫৩), আরলোট্টো একবার (পৃ. ১৬১)। (এবং এই একবারই আরলোট্টো (১৯৭২ : ১৭৭) থেকে গৃহীত একটি চিত্রের ঋণ স্বীকার করেছেন!) বাগর্থগত পরিবর্তনের তাত্ত্বিক অংশ পুরোপুরি নিয়েছেন উলমানের গ্রন্থের Historical Semantics নামক অধ্যায় থেকে। বাগর্থগত পরিবর্তন বিষয়ক মেইয়ে (Meillet)-র এবং স্পেয়রবের (Sperber)-এর তত্ত্ব সম্পূর্ণতই উলমান থেকে সংগৃহীত। পাঠককে তিনি বরং অন্য ধারণাই দিতে চেয়েছেন।

ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। তাঁর বই-এর প্রতিটি অধ্যায়ই কোনো না কোনো বই-এর আড়ষ্ট অনুবাদ। যেমন তাঁর বই-এর দশম পরিচ্ছেদটি: "তাত্ত্বিক কাঠামো; এবং ভাষা-পরিবর্তনের কারণ"। এটি গড়ে উঠেছে অ্যানডারসনের বই-এর দুটি অধ্যায়ের সম্মিলনে, যথাক্রমে দশম এবং পঞ্চম (দ্র. অ্যানডার্সন ১৯৭৩ : ১৯৯-২০৩, ৮৬-৯৮), অথচ যথাস্থানে তিনি তার স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। তিনি দুহাত ভরে ভাস্কর্য (তুলনীয় ভাস্কর : ভাস্কর্য) করেছেন, অথচ তাঁর অসীম কুণ্ঠা যথাস্থানে ঋণ স্বীকার করতে। এরকম অসততা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই গণ্য হতে পারে। বাংলাদেশের "একমাত্র" ভাষাবিজ্ঞানীর এ কোন শোচনীয় পরিণতি! অবশ্য কুম্ভীলক-বৃত্তির উদাহরণ এই বইটিই নয়, আজাদ সাহেবের 'বাক্যতত্ত্ব' (১৯৮৪) বইটির যাবতীয় তাত্ত্বিক আলোচনাই তিনি অপহৃত করেছেন জ্যাকবসেনের (১৯৭৭) বই থেকে কোনো উল্লেখ বিনা। আমরা তখন আর বিস্মিত হই না। তবে বর্তমান বইটি তাঁর

এই বৃত্তিকে শুধুমাত্র উজ্জলতরই করল না, বাংলায় ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় তিনি একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ভাবতে অবাক লাগে বইটির প্রকাশক ঢাকার বাংলা একাডেমীর মত একটি সম্মানিত বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠান। বাংলা একাডেমীকে আমার পরামর্শ, বইটির যদি কোনো পরবর্তী সংস্করণ হয়, তবে এই সংস্করণ গ্রন্থটির অনুবাদক-সংগ্রাহক হিশেবে যেন হুমায়ুন আজাদের নাম রাখা হয়, গ্রন্থকার হিসেবে নয়॥

উল্লেখপঞ্জি :

বাংলা

আজাদ, হুমায়ুন ১৯৮৪ বাক্যতত্ত্ব। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

ইসলাম, রফিকুল ১৯৭৫ ভাষাতত্ত্ব। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ। ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান।

মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ ১৯৮৯ 'সাহিত্য, সমাজদায়িত্ব ও রশদির দুর্মতি'। চতুরঙ্গ ৫০ : ১ ১-১১।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর ১৯৮৬ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সেন, সুকুমার ১৯৮ 'ভারতকথার গ্রন্থিমোচন'। বার্ষিক আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০—২২।

—১৯৮৭ ভাষার ইতিবৃত্ত। পঞ্চদশ সংস্করণ। কলকাতা : ইস্টার্ন পাব্লিশার্স।

ইংরেজি

Aitchison, J. 1981 Language Change : Progress or Decay? London : Fontana.

Anderson, J. M. 1973 The Structural Aspects of Language Change. London : Longman.

Anttila, R. 1972 An Introduction to Historical and Comparative Linguistics. New York : MacMillan.

Arlotto, A. 1972 Introduction to Historical Linguistics. Boston : Houghton Mifflin.

Azad, H. 1983 Pronomonalization in Bengali. Dhaka : Dhaka University Press.

Bhat, D. N. S. Sound Change. Pune : Bhasha Prakashan. 1972

Hock, H. H. 1986 Principles of Historical Linguistics. Berlin etc: Mouton de Gruyter.

Jacobsen, B. 1977 Transformational-Generative Grammar. Amsterdam : North Holland.

Jankowsky, K. R. 1972 The Neogrammarians. The Hague : Mouton.

Kurylowicz, J. 1947 *La nature des proce´s dits analogiques*. Acta Linguistica **5**. 17-34. (Reprinted in : E. P. Hamp, F. W. Householder and R. Austerlitz (eds.) 1966 Readings in Linguistics **2**. Chicago : Chicago University Press, 158-174).

Labov, W. 1963 *The Social Motivation of a Sound Change*. Word **19**. 273-309.

—1966 The Social Stratification of English in New York City Washington, D. C. : Center for Applied Linguistics.

Lehmann, W. P. 1962 Historical Liiguistics : An Introduction. New York : Holt.

Manczak, W. 1958 *Tendences ge´ne´rale des changements analogiques*. Lingua **7**. 298-325, 387-420.

—1978 *Les lois du de´veloppement analogique*. Linguistics. **205**. 53-60.

Wang, William S. Y. 1969 *Competing Changes as Cause of Residue*. Language **45**. 9-25.

Weinreich, U. W. Labov and M. I. Herzog 1968 *Empirical Foundations for a Theory of Language Change*. In : W. P. Lehmann and Y. Malkiel (eds.) 1968 Directions for Historical Linguistics. Austin : University of Texas Press.

অনুকথন : পাঠক শিরোনামটির সঙ্গে বছর তিরিশেক পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন। কবি গোলাম কুদ্দুস "স্বাধীনতা" পত্রিকায় প্রয়াত এক বিশ্রুত সমাজ-বিজ্ঞানীর মার্কসবাদ থেকে স্খলনে এমনি একটি শিরোনাম ব্যবহার করেছিলেন। সচেতনভাবেই তা আমি অনুসরণ করেছি। ভাষাবিজ্ঞানীর এমনতরো স্খলন দেখে। বস্তুত, আরো যথার্থ হত, যদি শিরোনামের পূর্বে 'একমাত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হত॥

সমাজ-জীবনের অনুষঙ্গে 'দুর্গা' চিত্রমালা

সমীর ঘোষ

'আমাদের বাঙলাদেশের একটি কঠিন অন্তর্বেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেই-জন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ বাঙলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা, এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে।'

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় উল্লেখিত উক্তির তাৎপর্য অসীম। ধর্মীয় অনুষঙ্গ যখন সমাজ-জীবনের প্রাত্যহিকতায় যুক্ত হয়, তখন তা হয়ে ওঠে ভিন্নমাত্রাধর্মী। শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের সাম্প্রতিক চিত্রমালা "দুর্গা"র আলোচনায় রবীন্দ্র-উক্তির প্রসঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে বাহুল্য মনে হলেও শিল্পীর চিত্রমালার তাৎপর্য বা উৎস অনুসন্ধানে এর ভূমিকা অনন্য।

ইউরোপের ধর্ম- বা পুরাণ-কাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় ভাবনার দূরত্ব অনেকখানি। আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ-জীবনে এই ধর্মীয় বা পৌরাণিক অনুষঙ্গ তেমন অর্থবহ হয়ে না উঠলেও ভারতবর্ষীয় জীবনভাবনার প্রাত্যহিকতায় ধর্ম বা পুরাণ নানা ব্যঞ্জনায় মূর্ত। ভারতীয় দেবদেবী বা পুরাণকাহিনীর চরিত্রবিশেষ ঘটনাপরম্পরায় আন্তরিক গ্রহণে অত্যন্ত নিকটজন হয়ে উঠেছে। সকলকেই আমরা আত্মার আত্মীয় করে কাছে টেনে নিয়েছি। ভক্তিভাবে শুধু দাস্যবোধ নয়, সখ্য ও বাৎসল্যেও এঁরা আমাদের প্রাণের প্রতিমা। বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির দুর্গা সেই কারণেই শুধু দুর্গতিনাশিনী রূপকল্পে নয়, উমা চিত্রকল্পের আধার সমস্যার মধ্যস্থিত বিন্দুতে স্থির।

ভারতীয় প্রাচীন ভাস্কর্যে দুর্গামূর্তির বিভিন্ন রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাচীন পুঁথি, পট-চিত্রেও নানা দুর্গামূর্তি আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে। এমনকী আধুনিক সময়েও বিভিন্ন ভারতীয় ভাস্কর এবং চিত্র-শিল্পী কখনো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, কখনো অনুরোধে, স্বকীয় ভঙ্গিতে এঁকেছেন দুর্গার রূপকল্প। ব্যক্তিভেদে উপস্থাপনা ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য লক্ষণীয় হলেও এসবের মধ্যে প্রথানির্দিষ্ট দুর্গাপ্রতিমার ধর্মীয় লক্ষণ স্পষ্ট। শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের দুর্গা এতৎকালের অভিজ্ঞতার বিপরীত মেরুর রূপকল্প। দৈনন্দিনের অভিজ্ঞতাকে ভারতীয়, বিশেষত বাঙালি, মানস-চেতনায় যুক্ত উমা-রূপাভাসের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে-ছেন। ফলে বাস্তবতার সাদৃশ্যের সঙ্গে প্রতীকী প্রতিমার মিশ্রণে উদ্‌ভাসিত হয়েছে এক নব্য দর্শন যা জীবনেরই ভিন্ন মাত্রায় মূর্ত।

বেশ কয়েক বছর আগে শিল্পী হুসেন এঁকেছিলেন দুর্গতিনাশিনী পাপসংহারের প্রতিমূর্তি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে যা বিতর্কিত এবং বহু সমালোচিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও পৌরাণিক রূপকল্পনার আভাস ছিল মূলত রূপকনির্ভর। সমাজবাস্তবতার কিংবা সমকালীন মতাদর্শের ঘেরাটোপে, অর্থাৎ যা প্রতিবাদী কিন্তু চিরন্তন সত্যের ধারাবাহিক ভাবনাস্রোতে মিলতে পারে নি। হুসেনের চিত্রমালার প্রধান চরিত্রলক্ষণ ছিল রূপকধর্মিতা। কিন্তু বিকাশ ভট্টাচার্যের দুর্গা রূপক নয়, প্রতীকী উপস্থাপনায় সমৃদ্ধ। প্রতি মুহূর্তের জীবনযাপন, প্রাত্যহিক প্রথানির্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্মসম্পাদনা, কিন্তু মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যেও যে কিছু শাশ্বত রূপ রয়ে যায় যা আমাদের বাহ্যিক গঠনবিন্যাসে নয়, অন্তর্গত চারিত্রবোধ প্রকাশের অন্যতম চিহ্ন—এই চিহ্নকেই শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য তুলে এনেছেন অনুভবের অতল থেকে। রূপকে অর্থময় অরূপ সত্যের চূড়ান্ত বিন্দুতে প্রোথিত করেছেন।

দুর্গা প্রকৃত অর্থে সম্মিলিত তেজ-সমষ্টি। দুষ্টের দমনে তিনি দুর্গা। বঙ্গীয় শব্দকোষে প্রদত্ত সূত্র অনুসারে দকার দৈত্যনাশ, উকার বিঘ্ননাশ, রকার রোগনাশ, গকার পাপনাশ ও আকার ভয়নাশ হেতু দুর্গা। কিন্তু এই দুর্গাকে আমরা কখনো জননী, কখনো কন্যার রূপকল্পনায় শ্রদ্ধা আর বাৎসল্যে কাছে টেনে নিয়েছি। শিল্পী মানসভাবনার বিবিধ অনুষঙ্গে সকল নারীর মধ্যে দুর্গা বা উমার উপস্থিতি লক্ষ করেন। বিকাশবাবুর নিজের কথায়—'এমন কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যা কারও কারও জীবনের রূপরেখাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, যেমন—আমার জীবনে দুর্গার ভূমিকা। ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয়। রথের দিন থেকে শুরু করে বিজয়া পর্যন্ত ওকে নানাভাবে নানারূপে দেখেছি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওকে নিশ্চিন্দিপুরের হরিহরের কন্যা হিসেবে গড়েছেন। সত্যজিৎ রায় তাকেই "পথের পাঁচালী"তে নিয়ে এলেন। দুর্গা সেদিন হেরে গেলেও আদতে সে কখনো হার মানে নি, হার মানবে না। সে দুর্গা কখনো মা, কখনো ভগ্নী, কখনো বধূ, কখনো কন্যা। আবার কখনো বা শুধু "সে"।' শিল্পীর মানস-ভাবনার মধ্যেই নিহিত আছে "দুর্গা" চিত্রমালার নামকরণের প্রকৃত তাৎপর্য। আটপৌরে বধূ কিংবা উৎসবপ্রাঙ্গণে প্রাণোচ্ছল লাবণ্যময়ী কিংবা আশ্রয় বা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ভাষা—সব ক্ষেত্রেই এই বাস্তবই হয়ে ওঠে মিথিক্যাল চরিত্রের চিহ্ন। সাময়িকতা চিরন্তন সত্যে পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন দ্যোতনায় এই নারীগণ প্রতিষ্ঠিত হন।

দুর্গা শিরোনামে মোট নয়টি ক্যানভাসের বিস্তারী পটে তেলরঙে আঁকা বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির প্রদর্শনী হল বিড়লা একাডেমির প্রদর্শশালায়। বিসর্জন (১), উমা (২), দয়াময়ী (৪), সুবর্ণ এবং অন্যেরা (৬), প্রফুল্লময়ী (৭), স্বপ্নময়ী (৮), স্বর্ণলতা (৯), দর্পণ-মিরর (১০), দর্পময়ী (১১) নামকরণের বিচিত্র ভাব-প্রকাশক ছবির বৈচিত্র্য বিশেষ উল্লেখ্য। ক্যাটালগে মোট ছবির সংখ্যা বারোটি থাকলেও স্প্রিং-হলি (৩), শ্যামা (৫) এবং সীমন্তিনী অ্যানড আদারস্ (১২) নামের ছবির ক্যানভাস প্রদর্শশালায় অনুপস্থিতির কারণ অজ্ঞাত।

বিকাশবাবুর দুর্গা-চিত্রমালায় প্রথম উল্লেখ্য ছবি 'দর্পময়ী'। আয়তাকার পটের ডান দিকের নিম্ন কৌণিক অংশে সারিবদ্ধ বেয়নটধারী রক্ষী-বাহিনী অজ্ঞাত নিষেধের দৃঢ় প্রাচীর তুলে স্থির। পটের মধ্যবর্তী অংশের সম্পূর্ণতাকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক মা, কোলে শিশু। মায়ের গতি সম্মুখবর্তী কিন্তু হঠাৎ সমস্ত নিষেধের বিরুদ্ধে কিংবা অশুভ সংকেতের প্রতিবাদে মুখর। গ্রীবাভঙ্গির দৃঢ় পিছুফেরা টানে জড়িয়ে আছে সংহার বা সংকটের মুখোমুখি আত্ম-প্রত্যয়ের মুখচ্ছবি। সমগ্র পটের আবহনির্মাণে শিল্পী বাস্তবতার বা সাদৃশ্যধর্মিতার সূক্ষ্মতা ব্যবহার করলেও তা নিপাট নির্মাণে সমতল নয়। বরং বাস্তবতাকে প্রকাশভঙ্গির চূড়ান্ত তাৎপর্যময় রূপায়ণে, প্রকাশ-বাদী ভঙ্গিতে রঙের চাপ-চাপ ব্যবহারে বিষয়ের তীব্রতাকে মুখর করে তুলেছেন। পিছনের কয়েক বছর বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবির বিষয় রূপারোপে যেমন স্থির প্রতিচিত্রের, বিশেষত অবয়বধর্মিতার প্রাধান্যের মধ্যেও এক বিশেষ ধরনের নাটকীয়তা এবং নির্মাণের নিপুণ আঙ্গিকে পটের গতিময়তা ছিল অনুপস্থিত। সম্প্রতি তাঁর কাজে যেন সেই স্থিতভার পরিবর্তে রঙের কর্কশ ব্যবহার বুনোটের আপাত অসংলগ্নতার মধ্যেও মজাদার গতিময়তার সঞ্চার লক্ষ

করা যাচ্ছে।

"বিসর্জন" নামের ছবিতে জলমগ্ন এক নারীর উপস্থিতি। শরীরের প্রায় অংশই জলের তলায়। শুধুমাত্র মুখ আর গলা, বুকের কিঞ্চিৎ আভাসিত। মৃতমুখে নিষ্পাপ প্রশান্তি। গলায় উজ্জ্বলবর্ণদ্যুতি-সম্পন্ন আভরণের উদ্‌ভাস। এই নাটকীয়তার মধ্যে অনুভবের বাস্তব ছোঁয়া এনে দেয় শিকড়হীন ঠিকানা-বিহীন ভেসে-আসা কচুরিপানার স্থিতি। দূরে জলমগ্ন ভাঙা বৈচিত্র্যহীন স্থাপত্যের প্রতিবিম্বিত জলছাপ ছবি। এই ছায়া যেন প্রচণ্ড অবলম্বনে বেঁধে রাখে ছবির বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত। আখ্যান বা ভাব ব্যঞ্জনার উপস্থাপনে শিল্পীর ছবির অর্থময়তা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে বাধ্য। তবু নানা কল্পভাবনার সূত্র ধরেই আমরা পৌঁছে যাই ছবির গঠনবিন্যাসের প্রার্থিত ভুবনে। "প্রফুল্লময়ী" ছবি মধ্যবিত্ত বাঙালি বধূর সংসার-যাপনের নিত্যপ্রবহতার কাহিনী। শহরের চেনা পথের দূর নির্দেশক পরিপ্রেক্ষিতে প্রফুল্লময়ী বাজার হাতে ফিরছেন। দু-হাত পণ্যের পসরায় বন্দী। এমনকী হাতের ভাঁজেও ধরা আছে সবুজ-সজীব লতা তথা শাক। শ্রমকাতর কিন্তু প্রফুল্লময়ীর মুখে তৃপ্তির স্পর্শ। ট্রাম লাইনের সমান্তরাল রেখা মানুষী গতির বিপরীতমুখী হওয়ার কারণে সংঘাতের তীব্রতা বিষয়ের সারল্যকে অনিবার্য নাটকীয় করে তুলেছে। "স্বর্ণলতা" ছবির বাস্তবগ্রাহ্য মানুষী প্রতিমা। অথচ ঘটনা-পরম্পরায় দুর্গাপুজোর মণ্ডপে অসংখ্য দর্শনার্থী মানুষ-মানুষীর ভিড়ের সংলগ্ন আবহে স্বর্ণলতা নিজেই মূর্তি-মান জীবন্ত বিগ্রহে পরিণত হন। প্রেক্ষাপটে ঈষৎ আভাসিত প্রাচীন রীতিবদ্ধ প্রতিমা ও দর্শকের রূপা-রোপে ইঙ্গিতময় প্রকাশবাদী নির্মাণরীতির পাশা-পাশি সম্মুখবর্তী স্বর্ণময়ী সাদৃশ্যের চূড়ান্ত পূর্ণতায় উজ্জ্বল। দুই বিপরীত নির্মাণভঙ্গির সহ-অবস্থান লক্ষণীয়। "দর্পণ-মিরর" নামের ছবিটি কিঞ্চিৎ স্যাটায়ারধর্মী বলেই আমার মনে হয়েছে। আখ্যান-বা বক্তব্য-প্রধান ছবির অন্তর্গত কাহিনী শিল্পীর ভাবনায় যে রূপ পায়, দর্শক- রুচি ও-ভাবনার বৈচিত্র্যে তা বিবিধ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়। এক্ষেত্রে কিছু ভুল ভাবনা কিংবা অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা থেকেই যায়। "দর্পণ-মিরর" ছবির চিত্রকলা তেমনি আমার কাছে নানা ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। প্রতিমার আবরণ উন্মোচনের পূর্বাবস্থার মুহূর্তটুকুকেই শিল্পী তির্যক দৃষ্টিতে ধরতে চেয়েছেন। কাঁচ-কাগজের পরদার আড়ালে প্রতিমার মুখের কিঞ্চিৎ আভাসিত। সর্বতো চেষ্টায় ফাঁক গলে যেন প্রতিমা আত্মপ্রকাশে উন্মুখ। বনেদি বাড়ির স্মৃতির প্রহরী মান্য অতিথি যেন এ আয়োজনের বাইরে পাথর-প্রতিম স্থির। দর্পণে সমগ্র ঘটনার ছায়াপাতের প্রকাশ যেন প্রাচীন রক্ষণশীল পরিবারের স্মৃতির স্মারক। সমগ্র পটের বিস্তারে রঙের কর্কশ ঘূর্ণন অধিক অংশেই ব্যাপৃত। আড়াল নির্মাণে ব্যবহৃত বাস্তব-সদৃশ পরদা আসলে চিত্র-রচনার ভাষায় অবসরের (space) প্রতিশ্রুতি। পটের নিম্নাংশের বাঁদিকের কোণে মালা-জড়ানো মান্যবর অতিথির মুখ ভারসাম্যরক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। আর ছবির প্রায় সমগ্র ধূসর-সাদার আবহে ঈষৎ বর্ণদ্যুতির প্রাণময় ভারসাম্য এনেছে দুর্গাপ্রতিমার মুখের উজ্জ্বল হলুদ আভা। বিষয়-ভাবনার সঙ্গে নির্মাণের যথা-যোগ্য সমন্বয়। "উমা" নামের ছবিটি তুলনামূলকভাবে বিকাশবাবুর পূর্বেকার চিত্রভাবনারই অংশবিশেষ। শুধু তৃতীয় নয়ন সংস্থাপনের জন্য দুর্গা চিত্রমালায় যেন যুক্ত হবার গ্রাহ্য কারণ দাবি করে। "দয়াময়ী" এবং "সুবর্ণ অ্যানড আদারস" এই ছবি দুটিতে দুর্গা-চিত্রমালার যে তাৎপর্য অর্থাৎ নারীচরিত্রের অবস্থানের ভিন্নতার মধ্যেও স্বরূপের অপরিবর্তনীয় স্থিতি তা থাকলেও অন্যান্য ছবির প্রতীকী ব্যঞ্জনা কিংবা নাটকীয়তার তুলনায় যেন কিছুটা ম্লান।

বিকাশ ভট্টাচার্যের "দুর্গা" প্রতীকী বিন্যাসে সমাজবাস্তবতায় যুক্ত। এই বাস্তবতা নিছক কোনো দায়বোধ থেকে উদ্‌ভূত, তেমন কষ্টকল্পিত বিশ্বাস বা ভাবনার কারণ নেই; বরং বলা চলে শিল্পীর

ধারাবাহিক চেতনারই এ এক অন্যতর পরিণতি। পূর্বে-ও শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবিতে ফোটোগ্রাফিক সাদৃশ্যে দর্শক চমকিত হয়েছেন, কিন্তু পাশাপাশি সমাজবাস্তবতার যে নিষ্ঠুর সত্যের প্রতি তিনি বারবার নানাভাবে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তা এই বাস্তব-দর্শনের আপাত জাদু-আকর্ষণে চেতনার বোধকে ছুঁয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। অবশ্য এর জন্য শিল্পী দায়ী নন। দায়ী দর্শকের মনন-চিন্তা-চৈতন্যের দৈন্য। সেই কারণেই বিকাশ ভট্টাচার্যের কৃৎকৌশলে দর্শক যত বেশি মুগ্ধ বিস্মিত, তাঁর বিষয়ভাবনার অন্তর্গত বোধে তেমন সাড়া পড়ে না। এই ভাবনার প্রেক্ষিতেই ঋত্বিককুমার ঘটকের "সারি-সারি পাঁচিল" রচনার প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। তিনি যা ভেবেছেন করতে চেয়েছেন এবং যাদের জন্য তাঁর জীবনপাত শ্রম, তা যেন অনুভবের অনুপস্থিতিতে গ্রহণের অপরিণত মানসিকতায় বিপর্যস্ত। আর তাই ঋত্বিককুমার ঘটক প্রায় আর্তনাদের স্বরে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান—আপনারাও একটি বড়ো পাঁচিল। বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো পাঁচিল।

'এরপরে আর ধরুন—ধরুন বলে লাভ নেই। আমাদের দেশ রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। আমাদের দেশের চাষি যে দর্শনের কথা বলে, তা মিলবে না বহু দেশেই। আমরা আপনাদের দুঃখকে বড়ো ভালোবাসি। আপনাদের আনন্দকেও। তবু আমরা নিশ্চিহ্ন না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আপনাদের ছাড়ব না। কিছু একটা জন্মাবেই, থরথর করছে আজ ছবির দুনিয়া।

'আপনারা আমাদের অনুভব করুন। বুঝুন আমরা একটা বহতা নদীর মাঝ দিয়ে বইছি। আজ এই মুহূর্তে আমরা যা, তাই আমাদের শেষ পরিণতি নয়। আমরা বাড়ব, আমরা অনেক বড়ো হয়ে অনেকটা ছায়া দেব, শুধু জলসিঞ্চনের অপেক্ষা।'

(চলচ্চিত্র / বার্ষিকী ১৯৫৯)

যে বিশ্বাস আর ভালোবাসার তাগিদে ঋত্বিক ঘটক এই উক্তি করেছিলেন, সেই বিশ্বাসই বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

সম্প্রতি একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকের পাতায় শিল্পীদের সম্পর্কে নানা স্বাদু চটুলদি বিষয়ভরা রচনার মধ্যে বিকাশ ভট্টাচার্য সম্পর্কে মন্তব্য রয়েছে—

'A Bikash canvas is more than a work of art, it is a widely recognised status symbol.'

শ্রেণীবিশেষের মানসিক দীনতার ছায়া এই মন্তব্যে স্পষ্ট এবং এরই প্রভাবে বৃহত্তর দর্শক-ভাবনাও প্রভাবিত হতে বাধ্য। অথচ বিকাশ ভট্টাচার্যের মধ্যবিত্ত সমাজ অবস্থানের ফলস্বরূপ পূর্বাপর চিত্রপটের বিষয় এই ফাঁপা মানুষদের মেকি জীবনযাপনের চিত্রকল্পে ভাস্বর কিংবা সামাজিক-রাজনৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রতি চূড়ান্ত রঙে রেখায় সোচ্চার প্রতিবাদ। 'দুর্গা' ভাবনার পরিণতিতেও সেই একই চিন্তার স্রোত বর্তমান। অথচ এক নিষ্ঠুর পরিহাসে সমগ্র বোধটাই যেন আড়াল হতে চায়। ঋত্বিক ঘটকের উল্লেখিত রচনায় একটি মন্তব্য আছে, —'আমাদেরও পেট ভরানোর সমস্যাই মূল সমস্যা। যার জন্যে এত ক্লেদ, এত পাপ।' শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য এমনই মন্তব্য করেছিলেন আজ থেকে প্রায় বছর পনেরো আগে এক সাক্ষাৎকারে—'বর্তমান ঘটনা আমাকে যতটাই স্পন্দিত করুক, তা নিয়ে কেন সবসময় ছবি আঁকা যায় না তার আরো একটা কারণ আছে। এটা ফাঁস করে দেওয়া উচিত হবে কি? আসলে ইমেজ থেকে চ্যুত হয়ে পড়ার ভয় আছে তো। আমার যে সুররিয়ালিস্ট ইমেজ, লোকে তার জন্য দাম দেয়। সেই ইমেজ বজায় রাখতে না পারলে জাত তো যাবেই, ভাতও যাবে। এইভাবেই আমরা পা টিপে-টিপে হেঁটে, গা বাঁচিয়ে চলে, শিল্পী সত্তা বাঁচিয়ে রাখি।' (অন্য মনে / সপ্তম বর্ষ / ২য় সংখ্যা ১৩৮১) আজকের অদ্ভুত আঁধারে তিমির-বিনাশী প্রতিবাদকেও প্রয়োজনের তাগিদেই অর্থ-মূল্যের কাছে আত্ম সমর্পণ করতে হয়। শিল্পীজীবনের এ-এক চরম ট্রাজেডি।

'দুর্গা' চিত্রমালা প্রদর্শনী / শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য। বিড়লা অ্যাকাডেমি / ২৫-৩০ এপ্রিল ১৯৮৯।

মতামত

১

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রসঙ্গ

চতুরঙ্গের পঞ্চাশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (মে ১৯৮৯) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র রচনাবলীর আলোচনা করেছেন শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। স্মরণ করা যেতে পারে, এ পত্রিকার চতুর্দশ বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ওয়ালীউল্লাহ্-র গল্প "এক আর নয়" (বৈশাখ-আষাঢ় : ১৩৫৯ / ১৯৫২)।

পাদটীকানির্দেশ থেকে জানতে পারি, শ্রীমুখোপাধ্যায় রচনাবলীর দুটি খণ্ডেরই আলোচনা করেছেন। কিন্তু আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রথম খণ্ডেই। শ্রীমুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন তিনটি নাটকের কথা। অথচ রচনাবলীর সম্পাদক-কৃত গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ আছে চারটি নাটকের : 'বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৩৭১ : ১৯৬৪), 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৩), 'উজানে মৃত্যু' (একাঙ্কিকা) "সমকাল" পত্রিকার ১৩৭০ সনের ষষ্ঠ বর্ষের দশম সংখ্যায় প্রকাশিত। শেষের এই একাঙ্ক নাটকটির কোনো উল্লেখ পাই না। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের রচনায়। দেখছি যে তিনি তিনটি নাটকের যথাযথ উল্লেখ করে জানাচ্ছেন যে ওয়ালীউল্লাহ্ একাঙ্কিকা-ও লিখেছিলেন, অথচ নাটকটির নাম জানালেন না।

"বহিপীর"-এর প্রকৃত প্রকাশসাল নিয়ে অন্য এক জটিলতার সৃষ্টি হয় সৈয়দ আকরম হোসেন-এর প্রথম খণ্ডের তথ্যের ভিত্তিতে। সম্পাদক জানাচ্ছেন : 'বহিপীর ॥ প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০। প্রকাশক : গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড, ৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।'—(১ম খণ্ড, গ্রন্থপঞ্জী, পৃ ৩৭৮)। অন্যদিকে জীবনীপঞ্জীতে আছে : '১৯৫৫ রচিত নাটক "বহিপীর"-এর জন্য P. E. N.-এর একটি আঞ্চলিক পুরস্কারপ্রাপ্তি।'—(পৃ ৩৯৩)। ফলে এই দু ধরনের তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে না "বহিপীর"-এর প্রকাশ সাল কোন্‌টি। তাহলে কি গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগেই কোনো সাময়িক-পত্রে কি নাট্য-পত্রিকায় প্রকাশের ভিত্তিতে '৫৫-র পি. ই. এন পুরস্কার ?

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র রচনা থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছিলেন মুনীর চৌধুরী তাঁর 'বাংলা গদ্যরীতি'-তে। 'চাঁদের অমাবস্যা', 'দুই তীর'-এর প্রকাশকাল উল্লেখ করলেও "বহিপীরের" সাল উল্লেখ করেন নি মুনীর চৌধুরীও। ফলে 'বহিপীরের' সঠিক প্রকাশ ও ১৯৫৫-র পুরস্কারপ্রাপ্তি বিষয় দুটিতে আমরা ধোঁয়াশার মধ্যে রয়ে গেলাম। এমনকী অন্য সূত্রেও জানতে পারলাম না। সম্পাদনার এই ত্রুটিটি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের চোখে পড়ে নি। এছাড়া, জীবনীপঞ্জীতে ওয়ালীউল্লাহ্-র মৃত্যুসাল ভুল দিয়েছেন সম্পাদক সৈয়দ আকরম হোসেন। সঠিক তারিখ হবে ১০ অকটোবর, ১৯৭১।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র সাহিত্য প্রসঙ্গে একটি ভাবনাই বারে-বারে ফিরে আসে যে তাঁর সাহিত্যচিন্তা ফরাসি-অস্তিত্ববাদী-দর্শনাক্রান্ত। কর্মসূত্রে তাঁকে অধিকাংশ সময়েই দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে, সহধর্মিনী ছিলেন ফরাসি, বিশ্বসাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন আগ্রহের সঙ্গে, আত্মস্থও করেছিলেন—এ সবই সত্য। কিন্তু সামগ্রিক সাহিত্যের মধ্যে দুটি রচনাকে ভিত্তি করে তাঁকে ফরাসি সাহিত্যের ভাবসঞ্জাত বাঙালি উপন্যাসিক হিসেবে চিহ্নিত করলে কোথাও বোধহয় ইতিহাসচেতনা এবং সাহিত্যগত মনোভূমিতে এক ফাঁক রয়ে যায়।

সৈয়দ আকরম হোসেনের সম্পাদকীয় ভাষ্য থেকে শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ও এমন এক সিদ্ধান্তে পৌছে যান : 'এ-দুটিতে (চাঁদের অমাবস্যা ও কাঁদো নদী কাঁদো) সমকালীন ফরাসি দর্শনের আর কামু-সার্ত্র্-এর অস্তিত্ববাদের প্রভাব লক্ষনীয়।' শ্রীমুখোপাধ্যায় আরও জানান : 'হাঙ্গেরীর লেখক টিবোর ডেরি-র রচিত 'মিকি'-র 'ইংরেজি অনুবাদ বা ফরাসি অনুবাদ ওয়ালীউল্লাহ্ নিশ্চিত পড়েছিলেন।' আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, এমন স্বতঃসিদ্ধের পিছনে ওয়ালীউল্লাহ্-প্রদত্ত বা সমর্থিত কোনো তথ্য তিনি পেয়েছেন কিনা। হতে পারে ডেরি-র রচনা তিনি পড়েছিলেন, যেমন তিনি আগ্রহী পাঠক ছিলেন বিশ্বের অগ্রসর মানসিকতার সাহিত্যে। কিন্তু তাঁকে ইংরেজি বা ফরাসি অনুবাদ—একটা-না-পেলে আরেকটা পড়তেই হয়েছিল—এমন প্রত্যয়ী ঘোষণার সপক্ষে কেবলমাত্র ওয়ালীউল্লাহ্-র জোগানো তথ্যই আমরা জানতে আগ্রহী। ওয়ালীউল্লাহ্-ই শুধুমাত্র নয়, আমাদের অন্যান্য সাহিত্যিক, বিশেষত ঔপন্যাসিকদের, প্রসঙ্গে আলোচনায় এই রীতির সাহিত্যগত প্রতিস্থাপনের মূলে সযত্নলালিত য়ুরোপকেন্দ্রিক মননই আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু সমাজ-ইতিহাসের নিরিখে উপন্যাসের যাথার্থ্য বিচার সম্ভব হয় না সাহেবদের হাত ধরে।

শুধু সাহিত্য আঙ্গিক কেন, পাশ্চাত্য থেকে আমরা নিয়েছি অনেক কিছুই, কিন্তু স্বদেশের স্বভাব-প্রতিভার মধ্যে তার যথাযথ প্রতিস্থাপন করে কখন তাকে নিজেদের মধ্যে জারিত করে নিয়েছি, জানি না নিজেরাই। তাঁর রচনাপাঠের পর মনে আসা অস্বাভাবিক নয়, এসব মানুষ, চরিত্রের জিজ্ঞাসার ধরন এমন কেন। এখানেই তিনি আমাদের এত-দিনের উপন্যাস-সম্পর্কিত ধারণা, পাঠের রীতি বদলে দেন, ফিরে তাকাতে বাধ্য করেন সমাজ-ইতিহাসের জটিল স্বরূপে। এক নির্দিষ্ট সামাজিক ধর্মীয় পরিমণ্ডলে আমরা পরিচিত হই বিচিত্র সব মানুষের মানসিক উপাখ্যানে। পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষ করে, উপন্যাস-রচনার সাম্প্রতিকতম ধারা তাঁকে সে সূত্র জোগায় হয়তো, কিন্তু কোনো অবস্থায় সে ভাবনা সার্ত্র্-র, কামু-র ভাবনার সঙ্গে সমান্তর নয়। অনেক দেরি হয়ে গেলেও আজ তাঁর রচনাপাঠের সময় নিশ্চিত হয়ে লক্ষ করি, ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সাহিত্য-ভাবনা শুরু করেছিলেন এক বড়ো অভিজ্ঞতা সম্বল করে। এমনকী তাঁর বিনীত স্বীকারোক্তি 'আমার লেখা পিছিয়ে রাখব তাদের জন্যে যারা পিছিয়ে আছে'—সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্য-অভিজ্ঞতা সমকালীন বাঙালি মুসলমানের আত্মজিজ্ঞাসার আন্দোলনের শরিক-সংলগ্ন হয়ে থাকে।

আমাদের মনে রাখা জরুরি : ওয়ালীউল্লাহ্-র চার বৎসর বয়সের সময়েই কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল প্রমুখদের সক্রিয় উদ্যোগে শুরু হয়েছিল "শিখা" পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের "বুদ্ধির মুক্তি" আন্দোলন, ১৯২৬-এ। "বুদ্ধির মুক্তি" বলতে তাঁরা বুঝতে চেয়েছিলেন : অন্ধ সংস্কার, আচারশাসিত সামাজিক অমানবিকতা থেকে মুক্তি, শাস্ত্রের আক্ষরিক অনুবর্তন থেকে যুক্তিপ্রয়োগের স্বাধীনতা, সম্প্রদায়ভিত্তিক চিন্তার পরিবর্তে ব্যাপক মানব-এষণা। স্বদেশে, স্ব-সমাজে যখন এই পরিস্থিতি, সে বিচারে আজ ভাবতে অসুবিধে হয় বইকি যে তাঁর সাহিত্যমানস গড়ে উঠেছিল ফরাসি অস্তিত্ববাদী দর্শনের ঐকান্তিক আশ্রয়ে !

কোনো বানোয়াট-সাহিত্য রচনা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল, সে ভাবনা বুঝতে পারি শওকত ওসমান-কে লেখা তাঁর এক চিঠির মধ্যে : 'মুহাম্মদ মুস্তাফার মতো লোকেরা (কাঁদো নদী কাঁদো) কখনো আত্মহত্যা করে না। এ কথাও নিতান্ত খাটি। তবে সেই জন্যেই তো আমার মুহাম্মদ মুস্তাফা আত্মহত্যা করেছে। দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও ওসব ভাবে না করে না যা চাঁদের অমাবস্যা'র যুবক শিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে। আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্ধ্বে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। সেটি হবে না। তা হলে কষ্ট ক'রে লেখার প্রয়োজন কী? মনের কোণে লুকোনো আশা বা স্বপ্নের (সে-সবের দাম যাই হোক) কথা কিছু প্রকাশ না করলে চলে কী করে ?'—(নভেমবর : ১৯৬৯। সূত্র : আনওয়ার আহমদ সম্পাদিত "রূপম", ঢাকা। ২৩ : ১ ; অকটোবর ১৯৮৮, পৃ ১৩৬। উদ্ধৃতিটি পাদপূরণে আছে)।

তরুণ পাইন
২৫/৪ নার্দার্ন অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-৩৭

২

কাঁহা হ্যায় মনজিল

১৯৮৯ মে-সংখ্যা চতুরঙ্গ পেলাম। এবারে একটি গল্প দেখলাম। বাংলাদেশের এই লেখককে জানি না। আহমদ-উজ-জামানের গল্পটির কথা বলছিলাম। লেখক দুটি ব্যাপারে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন—১. কদর্য নোংরা পরিবেশ সৃষ্টিতে। ২. অবস্থার চাপে মানুষ ধীরে-ধীরে কত নীচে নেমে যেতে পারে, আবার সেই অবস্থার সঙ্গে মানিয়েও চলতে পারে। এটি মানবজীবনের চিরন্তন তত্ত্ব।

ইফ্‌তেখারের কথাটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ—'এখন ১লা মে-র ডাকে তাদেরকে আর আহ্বান জানানো হয় না ; তারা অন্য লোক অন্য শ্রমিক হয়ে গেছে।'

গল্পের শেষ বাক্যটি আরও রসব্যঞ্জনাময়। "আসগর ইসমেতের দিকে তাকিয়ে জিগগেস করল—তুমি এখন আর ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা পড় না ? সাজ্জাত জহিরের লেখা ?'

লেখককে অভিনন্দন।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
কলকাতা-৭৫

৩

ফরাসি ভাষা প্রসঙ্গে

'মে' মাসের 'চতুরঙ্গ'-তে মূল ফরাসি থেকে মোলিয়্যার-এর তিনটি নাটকের অনুবাদ সম্বলিত আমার "মোলিয়্যার-এর তিনটি নাটক" নামের বইটির একটি মোটামুটি সপ্রসংশ সমালোচনার জন্যে রণেন্দ্রনাথদেবকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়ে সে সমালোচনায় তাঁর দু-একটি মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী মনে হওয়াতে সেগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সবিনয়ে দু লাইন লিখছি।

রণেনবাবুর মন্তব্য অনুবাদের ভাষা সম্পর্কে তিনি প্রথমে "মোলিয়্যার"-এর অপরূপ দ্যুতিময় ভাষা'র কথা বলে ঠিক তার পরেই 'ল্য বুর্জোয়া জঁতীয়ম্' নাটকটির গানের অনুবাদ সম্পর্কে বলেছেন সেগুলি 'গীতিধর্মের স্নিগ্ধতাবিহীন।' এখানে একটা কথা না বলে উপায় নেই যে মোলিয়্যার-এর ভাষা 'দ্যুতিময়' বলেই তার নাটকটির ভাষায়, এমন কী সে নাটকের গানের ভাষায়ও 'স্নিগ্ধতা' আশা করা যায় না। বস্তুত, ফরাসি ভাষা ঋজু, স্বচ্ছ, 'দ্যুতিময়', কিন্তু বা সেজন্যেই 'স্নিগ্ধ' নয় বলা যায় এবং সে ভাষায় রচিত প্রহসনধর্মী নাটকে নাট্যকার (মোলিয়্যার) স্বভাবতই তাঁর রচিত গানেও 'স্নিগ্ধতা' না দিয়ে প্রহসনের মেজাজই জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং ঐ গানগুলি মূল ফরাসি থেকে অনুবাদে যদি 'গীতি-ধর্মের স্নিগ্ধতাবিহীন' হয়ে থাকে তাহলে অনুবাদটি মূলানুগই হয়েছে বলতে হবে, অর্থাৎ রণেনবাবু এ বিষয়ে অনুবাদের খুঁত হিসেবে যা বলেছেন সেটা প্রকৃতপক্ষে অনুবাদটির লক্ষণীয় একটি গুণ!

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যাণী, নদীয়া

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
- বৈষ্ণব পদাবলী [৭৫.০০]
- রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত [৩০.০০]

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
- ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য [৩৭.৫০]

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
- উপনিষদের দর্শন [২০.০০]
- ঠাকুরবাড়ীর কথা [২৫.০০]

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
- উপনিষদের কথা [১০.০০]
- তন্ত্রের কথা [১০.০০]

অমিতা চক্রবর্তী
- সংস্কৃত নাটকের গল্প [১০.০০]

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া
- রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি [২৫.০০]

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
- তে হি নো দিবসাঃ [৪০.০০]

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
- রাজনীতি [১৫.০০]

অমলেন্দু দাশগুপ্ত
- ডেটিনিউ [৩.০০]

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ॥ কলিকাতা ৭০০ ০০৯